শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রিকা

[পূর্বার্দ্ধ]

ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

জ্যৈষ্ঠ—সন ১৩৩৩

ভাল কাপড়ে বাঁধাই ১ [বোর্ড বাঁধাই ..

ব্রহ্মচারী সুবোধ চন্দ্র

Krishna Prosad Ghosh

Prakash Press

St. Calcutta

উৎসর্গ

যুগকল্যাণ সাধন করিবার জন্য যিনি মায়াতীত হইয়াও দয়ায় গলিয়া মায়ারাজ্যে নরদেহ ধারণ-পূর্ব্বক পবিত্রধাম কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও তৎপরে দক্ষিণেশ্বর মহাপুণ্যতীর্থে অমানব লীলামাধুর্য্যের অবতারণা করিয়া প্রজ্ঞাচক্ষুহীন বিশ্ববাসীকে আধ্যাত্মিক জীবনের অপূর্ব্ব আলোক-পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই যুগত্রাতা— সমন্বয়াচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র শ্রীচরণপ্রান্তে এবং তাঁহার সেই পরামুক্তির অভয়শঙ্খ বাজাইয়া বিশ্বের দ্বারে নব জাগরণের প্রেরণা ও বাণী উপস্থিত করিবার জন্য তিনি যে চিরমুক্ত লীলাপার্ষদগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের পূত করকমলে এই 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা' পুস্তকখানি ভক্তি-অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পিত হইল।

ভূমিকা

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

—"যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানবদেহ ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হই ও ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সংস্থাপন করি।" এই ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া। তিনি যে' সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে' সময়ে পাশ্চাত্য জড়বাদের শিক্ষা ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আনয়নপূর্ব্বক

শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। সে' সময়ে হিন্দুরা, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শিক্ষিত যুবকগণ দলে দলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল। তাহারা খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও খৃষ্টানধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রচার করিতেছিল। ক্রমশঃ সেই ধর্ম্মগ্লানি-স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর হওয়ায়—তাহার বেগ অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ খৃষ্টীয়দিগের অনুকরণে দেবদেবী পূজার নিন্দা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। এ'দিকে আবার হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ, বিবাদ ও বিদ্রোহ চলিতেছিল এবং প্রত্যেকে আপন আপন মত সত্য ও অপরের মত মিথ্যা বলিয়া বিবাদ করিতেছিল। বৈষ্ণবগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ ভুলিয়া ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিলেন এবং শাক্তেরা কামাচার-মার্গকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তির পন্থা জ্ঞান করিয়া বীভৎস কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতে ধর্ম্ম-গ্লানির অভ্যুদয়কালে সনাতন-

ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ দেখাইবার নিমিত্ত এবং 'যত মত তত পথ' প্রচার করিয়া উদার সনাতনধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের এক অজানিত ক্ষুদ্র গ্রামে জনৈক নিষ্ঠাচারী সত্যবাদী দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অসাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক বাল্যাবস্থা হইতে অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি গ্রামস্থ জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণদ্বারা নিরক্ষর হইয়াও সর্ব্বজ্ঞত্বের পরিচয় প্রদানে সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন। যৌবনে উপনীত হইয়া তিনি রাণী রাসমণির কালীবাটীতে প্রেমিক পূজারীরূপে শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া—পরে সাধকভাবে দ্বাদশ বৎসর বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে কি সত্য আছে—তাহা জানিবার নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে প্রত্যেক মতানুযায়ী সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের চরমাবস্থা অনুভবদ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে—সকল ধর্ম্মই এক সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত এবং তাহারা একই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার এক একটি পন্থা মাত্র; সুতরাং কেহই মিথ্যা নহে, সকলই সত্য!

এই ভাবটি আমি তাঁহার একটি স্তোত্রে এইরূপে লিখিয়াছিলাম, যথা—

"সত্য বোধতয়া সাঙ্গান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ সমাচরন্।
ধর্ম্মমাত্রস্তু সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতং।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

—অর্থাৎ যিনি সকল ধর্ম্মমতানুযায়ী সর্ব্বাঙ্গীন সাধনের আচরণ করিয়া 'সকল ধর্ম্মই সত্য'—এই বোধ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই জগদ্গুরু শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। সেই সময়ে তিনি ইস্‌লাম ও যীশুখৃষ্টের মতানুযায়ী সাধন করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই অদ্বিতীয় সত্য সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ তাঁহার উদার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া "যত মত তত পথ" এই সত্যের আভাস লাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙ্গলা দেশে কেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এই প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয়—বঙ্গদেশ ভারতের মস্তিষ্কস্বরূপ; তখন

বঙ্গদেশই বিকৃতধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া অনাচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং সমস্ত শরীরের উপকার সাধন জন্য—মস্তিষ্কের সংস্কারকরণই যে'রূপ প্রয়োজনীয়, সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে তাহার মূল বা মস্তিষ্কস্বরূপ বঙ্গদেশের সংশোধন বা সংস্কারই সেরূপ মূল্যবান বলিয়া মনে হয় এবং সেই জন্যই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্গদেশে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যুগের ঠাকুর ও ভবকর্ণধাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন !

তৎপরে ইহাও সত্য যে—বৌদ্ধযুগ হইতে বাঙ্গালীরাই ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া জগদ্‌বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অপূর্ব্ব চরিত্র এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব তদীয় বাঙ্গালী শিষ্যবৃন্দই তাঁহার দেহত্যাগের দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র এবং ইউরোপ—আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন যে—যিনি শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—"শ্রীশ্রীজগন্মাতা

আমার ছবি (Photo) দেখিয়ে বলেছিলেন যে—এই ছবি পরে ঘরে ঘরে পূজা হ'বে।" বাস্তবিক এই অল্পদিনের মধ্যে সেই কথার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি! তদীয় প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) অপূর্ব্ব জীবন-চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এত মহান্ যে, বর্ণনা করিতে যাইলে—তাঁহাকে ছোট করা হয়।" বাস্তবিকই ইহা সত্য; সকল শাস্ত্র—সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি পড়িয়া আমাদেরও সর্ব্বদা মনে হইতেছে যে—অলৌকিকচরিত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

এক্ষণে সেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াচার্য্য ও যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্ত্তমান ভারতে অবতীর্ণ হইয়া "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" যে'রূপ নানাভাবসমন্বিত লীলার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তদীয় পার্ষদরূপে তাঁহার দিব্যমূর্ত্তির সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যে অপূর্ব্ব চরিত্রের পবিত্রাদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার দেহাবসানের

পর ব্যক্ত করিবার বাসনায় ও তাঁহার অলৌকিক মহিমা প্রচার করিবার মানসে কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে "শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃত" নামক স্তোত্রটি মুমুক্ষুর প্রতি সদ্‌গুরুর উপদেশরূপে রচিত হইয়াছিল। সেই স্তোত্রের গভীর ভাব—বেদ, পুরাণ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যাদ্বারা সাধারণের বোধগম্য করাইবার ইচ্ছা আমি অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম। এতদিন পরে আমার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

"শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা" নাম দিয়া লেখক উক্ত স্তোত্রের প্রত্যেক পদের সুন্দর দীপিকাসহ প্রাঞ্জল ও সুললিত বাঙ্গালা ভাবায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। দীপিকা এবং বাঙ্গলা ব্যাখ্যাতে তিনি উপনিষদ্, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকসকল উদ্ধৃত করিয়া উক্ত স্তোত্রের প্রত্যেক পদের ভাবার্থের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়া গভীর তত্ত্বসমূহ সাধারণ পাঠকপাঠিকাদিগকে সরল-ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা কবিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের

বিভিন্ন ভাষ্যকারদিগের মতামত ও ষড়দর্শনের মত বর্ণিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধমত, জড়বাদী চার্ব্বকদিগের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ, আত্মার অস্তিত্ব, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ, সৃষ্টিতত্ত্ব, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতামত—সমস্তই যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যও দেখান হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব চরিত্রের ঘটনাবলী যথাস্থানে বর্ণনা করিয়া তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে কাম ও কাঞ্চন ত্যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য ছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আশা করি এই সকল ব্যাখ্যা—তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের সংশয় দূর করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবে।

পরিশেষে "শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা" লেখককে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি—

শ্রীরামকৃষ্ণশ্রীচরণাশ্রিত
স্বামী অভেদানন্দ

নিবেদন

-:*:-

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতুলনীয় চরিত্রসম্বন্ধে কিছু লিখিতে বা বলিতে যাওয়া বাস্তবিকই—সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন তুল্য প্রতীয়মান হয়। কেবলমাত্র অবতার, পরমহংস ও মহাপুরুষ ইত্যাদি বাচনিক অভিধান প্রদানে ও দুই একটি অলৌকিক চরিত্র লিখনদ্বারা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায় না; তিনি ছিলেন বর্ণনাতীত —অনন্তভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ, 'অনন্ত ভাবের ইতি করা যায় না'—ইহাই ছিল শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর কথা, সুতরাং সঙ্কীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারী আমরা সেই অনন্তকে কিরূপে অনুভব করিতে সক্ষম হইব? আহা! যাঁহার অলৌকিক পূতচরিত্র সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া বিশ্ববিজয়ী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে বলিয়াছেন—"ওরে! শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে আমার ভয় হয়, শেষে কি শিব গড়্‌তে গিয়ে বানর গড়ে ফেল্‌ব?"

এক্ষণে ইহাই যদি হয় তাঁহার উক্তি, তখন অন্যপরে কা কথা? যাঁহার পবিত্র লীলাচিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীও আপনার অক্ষমতা স্বীকারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অমিয়-তত্ত্ব ও লীলা বর্ণন করা কি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের কার্য্য? আমাদের লেখনী ধারণই যেন একটি দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া মনে হয়। সেই নিমিত্ত সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও গুণীবৃন্দের নিকট এই বিনীত নিবেদন যে—বর্ণনাতীতচরিত্র লোকনায়ক ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তত্ত্বময়ী লীলা লিখনে পদে পদে ত্রুটীই লেখকের লিখিত হইবে, তাঁহারা যেন নিজগুণে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের অসীম করুণার পরিচয় প্রদান করেন।

পুস্তকখানি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী লিখিত "শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ স্তোত্রামৃত" অবলম্বনে রচিত। সাধারণের বোধগম্যার্থে ইহার অন্বয়, সরলার্থ ও দীপিকা নাম্নী একটি বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 'দীপিকা' বলিতে পাঠকপাঠিকাগণ যেন শঙ্করানন্দ-কৃতাদির ন্যায় মনে না করেন। শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ শ্লোকের মধ্য দিয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমিয়

চরিত্রটি যেরূপভাবে প্রস্ফুটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, লেখকও সেইভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র। শ্লোকপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের যতটুকু লীলামৃত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকেই বিশদভাবে শাস্ত্রযুক্তি, উদাহরণ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় লীলাসহচরগণের উপদেশবাক্যসহ প্রকাশ করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" লেখককে বহুঅংশে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে। তৎপরে পুস্তকের মধ্যে 'শ্রীমৎ আচার্য্যদেব' বলিয়া যে উক্তি আছে, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত।

বিভিন্নকারণে পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; সহৃদয় পাঠকপাঠিকা—আশা করি এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধিকরণে ইচ্ছা রহিল।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহার অসীম করুণা প্রদর্শনে পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া এবং ইহার পাণ্ডুলিপি আদ্যপ্রান্ত দেখিয়া ও নানাস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও অভয়-

বাণী না পাইলে, সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে পুস্তকখানি প্রকাশ করা কখনই সম্ভবপর হইত না। তাঁহার কার্য্য তিনিই করাইয়া লইয়াছেন, যন্ত্র—মাত্র যন্ত্রীর সেবায় বা সাহায্যে লাগিয়াছে ভাবিয়া, সে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় শ্লোকের অন্বয় রচনা ইত্যাদিতে বিশেষ সাহায্য করিয়া, পূজনীয় ব্রহ্মচারী রাঘবচৈতন্য মহারাজ পুস্তকপ্রকাশে উৎসাহদানে ও ব্রহ্মচারী সুবোধচন্দ্র ইহার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া লেখককে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য, পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সদ্‌রূপানন্দজী মহারাজ তাঁহার অসুস্থতা সত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পুস্তকখানির আদ্যপ্রান্ত প্রুফ দেখিয়া ও স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। লেখক তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী।

এক্ষণে নিবেদন, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই তত্ত্বামৃতখানি পাঠ করিয়া যদ্যপি কেহ উপকারপ্রাপ্ত হন, তবে সে গৌরব একমাত্র 'স্তোত্রামৃত' প্রণেতা

শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের,—লেখক তাঁহার যন্ত্র ও শ্রীচরণাশ্রিত দাস মাত্র এবং ইহাতেই সে নিজেকে ধন্য মনে করিবে। ইতি

অক্ষয় তৃতীয়া
কলিকাতা
সন ১৩৩৯

বিনীত—
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সেবক
ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

পূর্ব্বাভাস

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

সমাপ্ত —

ওঁ

শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃতং

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো,
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালং।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখাব্ধৌ,
সন্তাপ সংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥১॥

দুর্ব্বার-ঘোর-ভবদাববিদহ্যমানো,
জন্মন্যসে মলিনবাসনয়া সুখাপ্ত্যৈ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ,
সন্তাপ-সংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥২॥

শাস্ত্রেষ্বনাত্মসু কথং হি তব প্রবৃত্তিঃ,
দুস্তর্কজালমিহ দেশিকবাগ্বিরুদ্ধং।
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজ মন্দবুদ্ধে,
সন্দেহ-বিভ্রমহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥৩॥

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তিঃ,
তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন সিষেব্যমানে।
বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতূন্,
সন্ত্যক্ত-কামকনকং ভজ রামকৃষ্ণং ॥৪॥

ভার্য্যামশেষগুণভূষিত ভক্তিযুক্তাং,
যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তথৈব।
দূরাৎ প্রণম্য জিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা,
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণং ॥৫॥

সংস্পৃশ্য ধাতু নিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ,
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যো ভবেজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য,
স্তং ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥৬॥

প্রেম্নঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং,
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।
তৎ প্রাপ্তুমিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্দ্র চিত্তান্,
কুর্ব্বন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকৃষ্ণং ॥৭॥

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো,
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতুশূন্যঃ।
যৎ প্রেমহেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং,
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণং ॥৮॥

প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না,
ত্বন্তর্হিতে ভবতি ভাব বিকারযুক্তা।
আরাদ্গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভক্তে,
প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণং ॥৯।

সংসার-দুঃখ-বিকৃতো ভজনানুরাগঃ,
শুদ্ধীকৃতঃ প্রিয়কথা-করুণা-কটাক্ষৈঃ।
আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা,
স্তং ধর্ম্মমোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১০॥ *

যোগৈশ্চ সাধনশতৈঃ ফলমাপ্যতে যৎ,
যদ্বা সুখং ভবতি চিত্তনিরোধনেন।
যচ্ছন্নিধিঃ মুহুরুপেত্য পুমাঁল্লভেত্তৎ,
তং শান্তিশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১১॥

* এই দশটি শ্লোকের ব্যাখ্যা লইয়া "শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা" (পূর্ব্বার্দ্ধ) রচিত হইয়াছে।

নারায়ণং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং,
দৃষ্ট্বা শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাং।
ভৃত্যায়তেঽপ্যখিলভূত-মহেশ্বরো য,
স্তং স্বাভিমানরহিতং ভজ রামকৃষ্ণং ॥১২॥

নাধীত-শাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা,
নাধীত-বেদ ইহ য শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
নাধীত-তন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্ম্মবক্তা,
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১৩॥

নির্ব্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী,
নিষ্কর্ম্মকোঽপি সততং পরকর্ম্মকর্ত্তা,
নির্দ্দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং,
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১৪॥

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতো নিজপার্ষদৈ র্যো,
গায়ন্ হসন্ ভগবতঃ সুখয়ন্ প্রসঙ্গৈ।
স্তারাগণৈরিব বিধুর্দ্যুতিমত্র ধত্তে,
তং স্বর্গশর্ম্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১৫॥

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যপি শম্ভুভক্তৈঃ।
কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষ্ণবশেখরৈশ্চ।
জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঃ,
সংজ্ঞায়তে চ তমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১৬॥

ভ্রমন্ নানা যোনৌ, বহুবিধ শরীরং পরিগতঃ,
সুখং নাল্পং লেভে, কনকযুবতীভোগবিষয়ৈঃ।
ইদানীং জ্ঞাত্বা ত্বাং, প্রণত-সুহৃদং শান্তিসুখদং,
বিরক্তোঽহং যাচে, তব চরণয়োর্ভক্তিমচলাং ॥১৭॥

গৃহীত্বা ভ্রান্তং মাং কুমতি বিষয়াশাপরিবৃতং,
সদা রক্ষ ব্রহ্মন্, কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ।
কৃপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে,
বিবেকং বৈরাগ্যং পরম মে দেহি ভগবন্ ॥১৮॥

যো ভজেৎ পরয়াভক্ত্যা রামকৃষ্ণং ভবান্তকং,
ভববন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ সদ্যো ভবেন্ন সংশয়ঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ অভেদানন্দ স্বামিনা বিরচিতং
শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ-স্তোত্রামৃতং সমাপ্তং ॥

শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

---

(১)

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

—গীতা

(২)

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি স যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥"

—চণ্ডী

(৩)

"স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি সহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্ ।
গীতং শান্তং মধুরপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ,
সোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥'
—স্বামী বিবেকানন্দ

(৪)

"লোকনাথশ্চিদাকারো রাজমানঃ স্বধামণি,
কলিকল্মষমগ্নানামুত্তারণ—চিকীর্ষয়া ।
মায়াশক্তিং সমাশ্রিত্য যোহবতীর্ণো মহীতলে,
নমোহস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

(৫)

"লোকনামেব শিক্ষার্থং তপস্তপ্ত্বা সুদুস্তরং ।
নিদ্রাশনং পরিত্যজ্য বর্ষাণাং দ্বাদিকান্ দশ ॥"

(৬)

"লীলারূপহরেরেবং ভক্তার্থং দেহধারিণঃ ।
রামকৃষ্ণস্বরূপস্য নানাভাবসমন্বিতান্ ॥

(৭)

"যং ব্রহ্মা-বিষ্ণূ গিরিশশ্চ দেবাঃ,
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যম্।
তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য পরাবতারো,
দ্বিবাহুধারা ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥"

—স্বামী অভেদানন্দ

—প্রণাম—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিনে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

ওঁ হরিহরিরোং তৎসদোম্।

——:০:——
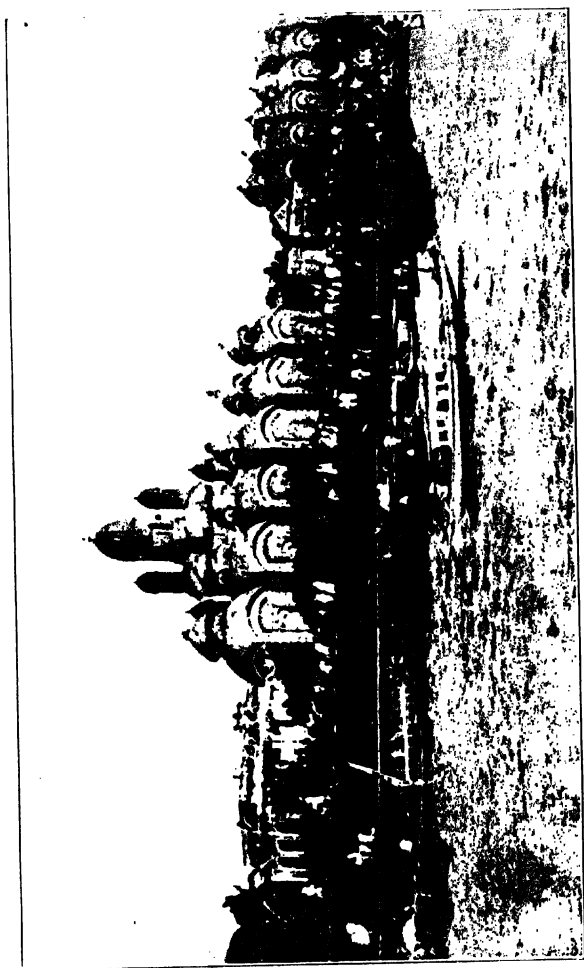
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা

পূর্ব্বাভাস

সামাজিক—আধ্যাত্মিক,—যে কোন প্রসঙ্গ বা উপদেশ বক্তা ও শ্রোতার অপেক্ষা রাখে। উপযুক্ত বক্তা এবং উপদেশধারণক্ষম উপযুক্ত শ্রোতা না হইলে —প্রস্তরে বীজ বপনের তুল্য উপদেশ গাথা ব্যর্থই হইয়া থাকে; সেজন্য প্রাচীন ঋষি ও আত্মদ্রষ্টা আচার্য্যগণ উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া—বক্তা ও শ্রোতাকে উপলক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদসমূহে দেখা যায়,—কোথায়ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যার বক্তা,—ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী বা জনকাদি রাজন্য-বর্গ ও ঋষিগণ শ্রোতা,—জ্ঞানবান্ মৃত্যুপতি বক্তা,

শ্রদ্ধাবান্ নচিকেতা শ্রোতা ;—মুক্তাত্মা মহর্ষি পিপ্পলাদ বক্তা, ভরদ্বাজ—সত্যকামাদি ঋষিগণ শ্রোতা ;—যোগবাশিষ্ঠে—বশিষ্ঠদেব বক্তা ; রামচন্দ্র শ্রোতা ;—গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্তা ও সাধকাগ্রণ্য অর্জ্জুন শ্রোতা। তৎপরে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও ঐরূপ শ্রোতা বা গুরু-শিষ্য সংবাদ-প্রণালী দৃষ্ট হয়।

ইহা সত্য যে,—শ্রোতা বা শিষ্য না থাকিলে বক্তা বা আচার্য্যের উপদেশ নিরর্থক হয়,—সে জন্য বৈদিক-যুগপ্রবর্ত্তিত গুরুশিষ্য প্রণালী পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের বক্ষ দিয়াও চলিয়াছে এবং চলিয়া আসিতেছে অবাধগতিতে এখন পর্য্যন্ত !

এই গুরুশিষ্য প্রবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক-তথ্য সম্বন্ধে যদি আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি—দেখিব, যখনই স্ব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়া বা সৃষ্টি রাজ্যের প্রজাভুক্ত হইলাম আমরা,—তখনই সর্ব্বজ্ঞত্ব আলোকটী স্বতঃ প্রেরণায় অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইল আমাদের,—ব্যবহারিক জগতের বা মায়িক দ্বৈতক্ষেত্রের স্বধর্ম্ম-রাশি—অজ্ঞত্ব ও সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাদি সাদরে বরণ করিল, এবং আমরা হইলাম তখন প্রাজ্ঞ জীব। শাস্ত্র বলেন—

সৃষ্টির প্রয়োজন মুক্তির জন্য;—অন্ধকার না হইলে যেমন আলোকের আকাঙ্ক্ষা জাগে না—অজ্ঞানতা না থাকিলে যেরূপ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, সৃষ্টি না হইলেও সেরূপ মুক্তির সন্ধান থাকিত না;—সে জন্য সৃষ্টজীব শাস্ত্রকারের মতে—অজ্ঞতার মধ্য দিয়া নিম্ন হইতে ক্রমশই উচ্চদিকে ধাবিত হয়।*

সৃষ্টজীবকে প্রধানতঃ—দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; প্রথম—যাঁহারা ব্যবহারতঃ জীবনযুদ্ধোপযোগী সামর্থশালী হইয়া সাংসারিক কর্ম্মে মন নিয়োজিত করেন তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া জীবিকানির্ব্বাহে ও প্রকৃত উদ্দেশ্য (সৃষ্টির রহস্যানুযায়ী) মুক্তি বা জ্ঞানলাভকে বিস্মৃত হইয়া এবং দ্বিতীয় হইতেছে—জীবন-সংগ্রামে সমর্থ হইয়া বৈরাগ্যসম্পন্ন স্বয়ং শিক্ষা. আলোচনা ও সাধনাদিদ্বারা জন্মরহস্যোদ্ঘাটনে কৃতকার্য্য হন যাঁহারা সংসারের যাবতীয় ভোগসুখে অতৃপ্ত হইয়া। ইহাতে দেখা যায়—প্রথম হয় দ্বিতীয়ের সাহায্যাপেক্ষী—তাহার আবরণ দূর করিবার জন্য,—

* সূক্ষ্মদর্শীর মতে—গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই 'কুরুক্ষেত্র' অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রের (জগতের) বিশেষণ দিয়াছেন 'ধর্ম্মক্ষেত্র', যথা—'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—' ইত্যাদি।

কারণ নিম্নের স্বধর্ম্মই হইতেছে উচ্চাদর্শের অনুসরণ করা এবং সেজন্য ভারতে বৈদিকযুগ হইতেই (ইহার প্রেরণায়) উচ্চ নীচকে—বিদ্বান্ মূর্খকে—জ্ঞানী অজ্ঞানীকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। এই ধারা শুধু ভারতে কেন, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং অদ্যাপি তাই রহিয়াছে।

উপর্যুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নিবৃত্তিমার্গগামী মুমুক্ষু মানবগণ যখন বুঝিলেন—জ্ঞানলাভ ব্যতীত যথার্থ শান্তিলাভ অসম্ভব এ জগতে এবং তল্লাভার্থ জ্ঞান চর্চ্চা ও তপস্যার একান্ত প্রয়োজন, তখন তাঁহারা উক্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং সত্য সত্য সফল কামও হইলেন। সাগর কিম্বা নদী যেরূপ বর্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হইলে—আপনাধার পূর্ণ দেখিয়া শূন্য কিম্বা তন্নিম্ন আধারগুলিকে পূর্ণ করিতে অগ্রসর হয়; সফল কাম—শান্তিদ্রষ্টা মহাত্মাগণও সেরূপ অমৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া করুণাবিষ্ট হৃদয়ে উপস্থিত হইলেন তাঁহাদের উপলব্ধ-জ্ঞানভাণ্ডারসহ জ্ঞানহীন আত্ম-বিস্মৃতগণের সম্মুখে এবং অযাচিতভাবে বিতরণ করিতে লাগিলেন তাঁহাদের সেই জ্ঞানরাশি—যথার্থ উপায় বা পন্থা নিদর্শনে। ইহা হইতেই গুরুশিষ্য,—শিক্ষক

ছাত্র বা বক্তা ও শ্রোতার উদ্ভব হইল এই সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে।

উপদেশক্ষেত্রে আচার্য্য ও শিষ্য,—উভয়েরই যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন;—কারণ, উপযুক্ত জ্ঞানবান্ আচার্য্য না হইলে যেরূপ শিষ্যের সন্দেহান্ধকার দূরীকৃত হয় না, অপরপক্ষে অনুপযুক্ত শিষ্য হইলেও সেরূপ উপদেশ ধারণে সক্ষম হয় না; সেজন্য শাস্ত্র বারংবার অধিকারী নির্ণয়চ্ছলে বলিয়াছেন—

"প্রশান্ত চিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায়,
প্রক্ষীণদোষায়—যথোক্তকারিণে।
গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা—
প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে॥"

—অর্থাৎ যে ব্যক্তির চিত্ত শান্ত ও বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনোদোষ সকল দূরীভূত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, সেই সদ্গুণসম্পন্ন—অনুগত শিষ্যকে গুরুদেব ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবেন। বাস্তবিক, জিজ্ঞাসু ও ধারণক্ষম—উর্ব্বরাধার না হইলে উপদেশ-বীজ উপ্ত সত্ত্বেও অঙ্কুরিত হয় না, তাই সর্ব্বাগ্রে 'আধার-

প্রস্তুত করিতে হয়। ঠিক্ ঠিক্ আধার সম্পন্ন অধিকারী না হইলে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করা যায় না। সূর্য্যের আলোক মৃত্তিকা, বৃক্ষ, প্রস্তর, দর্পণ ও সলিল প্রভৃতিতে সমভাবে পতিত হইলেও—দর্পণ ও সলিলেই যেরূপ তাহার প্রকাশাধিক্য দৃষ্ট হয়,—সেরূপ নির্ম্মল-স্বভাবসম্পন্ন জিজ্ঞাসু শিষ্যের উপরই শ্রীগুরুর কৃপাকণা অযাচিতভাবে বর্ষিত হয়। * * তৎপরে প্রয়োজন শান্তিলাভের ইচ্ছা বা মুমুক্ষুত্ব,—প্রশ্ন ও উপদেশ ধারণ-ক্ষমতা, কারণ—মুমুক্ষু না হইলে কোন প্রশ্নই জাগে না হৃদয়ে এবং প্রশ্ন না উঠিলে আচার্য্যদেব মুক্তিরহস্য-সমাধানে অগ্রসরও হন না কখন। প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা একরূপ ক্ষুধাস্বরূপ, অতএব ক্ষুধা না থাকিলে খাদ্য মিলিবে কেন? এই ক্ষুধার সঙ্কেতেই ব্রহ্মসূত্রকার গ্রন্থের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। (১) তৎপরে—সক্ষমতা অর্থাৎ প্রশ্নসমাধানে আচার্য্যোক্ত উপদেশ সমূহের মর্ম্মানুধাবন করিবার শক্তি প্রয়োজন।

(১) সাংখ্যকারিকার প্রথম সূত্রেও ঠিক এতদনুরূপ ইঙ্গিত পাইয়া থাকি আমরা, যথা—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ"—অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই আধ্যাত্মিক, আধি-

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" শ্রদ্ধা,—যাহার ব্যাখ্যাকরণে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"যৎ পূর্ব্বকঃ সর্ব্ব পুরুষার্থসাধন প্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ।" —অর্থাৎ যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসাধন—মুক্তিতে প্রবৃত্তিজন্মে, সেই চিত্ত প্রসাদকর আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধানামে কথিত। অতএব এই শ্রদ্ধা (২) ও তদনুগামী ভক্তিও মুমুক্ষুর একান্ত বরণীয়, কারণ—'মোক্ষকারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী'।

এক্ষণে দেখা যাক্—যথার্থ অধিকারী বা শিষ্য হইতে গেলে শিষ্যের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন। শিষ্যের প্রথম প্রয়োজন—স্বীয় অহংপূর্ণ ব্যক্তিত্বটীকে

ভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধদুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া সুকৃতিবশে যদি সেই দুঃখবিনাশক উপায় পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হয়, তবেই তাহাকে 'জিজ্ঞাসা' অভিধানে অভিহিত করা যায়।

(২) শ্রদ্ধার্থে আচার্য্যদেব বিবেকচূড়ামনিতে বলিয়াছেন—"শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণম্। সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥" ২৬॥

প্রদান করা শ্রীগুরুচরণে বলিস্বরূপে ; দ্বিতীয়—সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে যন্ত্রস্বরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সেবাকরণে ; তৃতীয় প্রয়োজন—উপর্য্যুক্ত শ্রদ্ধা—ভক্তি ও বিশ্বাস ;—“গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরু-র্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেবং পরং ব্রহ্ম—” অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবদেবীর একমাত্র প্রতীক্ শ্রীগুরুদেব এবং তিনি যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য (ক) ও সত্য,—এই স্থির বিশ্বাস। চতুর্থ—চাই সেবা ;— ঈশ্বর নিরাকার, তিনি পুনঃ সাকারে সংসারপাশমুক্তকারী শ্রীগুরুরূপী,—তাঁহার সেবাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের সেবা অথবা পূজা—এই জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করা। (খ) ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—
“সেবা বন্দি আওর অধিনতা, সহজ মিলি রঘুরায়ী।”
গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—“তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেনসেবয়া॥ গীতায় দেখা যায় অর্জ্জুন বিবেকসম্পন্ন হইয়া যখন বলিলেন—

(ক) কেন? তৎসম্বন্ধে পরে ব্যাখ্যা করা হইবে।

(খ) নিত্যতন্ত্রকারও তাই বলিয়াছেন—

“গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।”

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥"

—তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক্ ঠিক্ শিষ্য অর্জ্জুনের ভার গ্রহণ করিলেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী গার্গীকে গুরুশুশ্রূষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"শুশ্রূষা যা গুরৌ নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যমুদাহৃতম্।"

—অর্থাৎ নিয়মিতরূপে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গুরুশুশ্রূষাকেই 'ব্রহ্মচর্য্য' বলে।—শিষ্যকে কৃচ্ছ্র-সাধনাদি করিতে হইবে না, যথার্থ গুরুসেবা করিলেই তাহার ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হইবে। যাহা হউক, এ সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন না হইলে—ঠিক্ ঠিক্ শিষ্য হওয়া যায় না। কথায় আছে—

'ভিখারী না হলে রাজার করুণা,
সফল কামনা মিলে না মিলে না,
শ্রীগুরুচরণে সব বলিদানে
(কর) জয় মণ্ডিত জীবনে ॥'

—অর্থাৎ আপনার বলিতে কিছু না রাখিয়া শান্তিকামী শিষ্য যদি শ্রীগুরুচরণে ব্যাকুলতাভরে

আশ্রয় গ্রহণ করে, তবেই গুরুদেব শিষ্যের দুঃখে বিগলিতচিত্ত হইয়া বলেন—

"মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসার সিন্ধো স্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥

—বিবেকচূড়া-মণি। ৪৫।

—হে শিষ্য! তোমার ভয় নাই, এ সংসার সাগরপারের উপায় আমি তোমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ
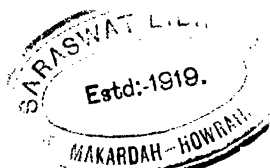
প্রথম অধ্যায়

গ্রন্থ রচনার সুবিধা ও পাঠক পাঠিকাবর্গের সহজ বোধগম্যের নিমিত্ত এই গ্রন্থেও 'আচার্য্য'—শিষ্য,-বক্তা ও শ্রোতার ধারা গ্রহণ করা হইল। শিষ্য যখন সংসারের ভয়াল ভ্রূকুটীতে ব্যাকুলিত হইয়া শ্রীগুরু-দেবের চরণপ্রান্তে শান্তি বা জ্ঞানলাভের আশায় পতিত হইল, চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুদেব তখন শিষ্যের ব্যাকুলতা ও মোহাতিশয্য দর্শন করিয়া—তন্নিবারনার্থে করুণাবিগলিতচিত্তে কহিলেন—'হে শিষ্য! আধুনিক যুগপ্রবর্ত্তক সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অমিয় সাধন-রহস্য ও অদ্ভুত-চরিত্র তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি,—শ্রবণ করিলে তোমার মোহ নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে এবং যথার্থ আত্মপ্রসন্নতায় শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইবে।'—এই প্রকার

কহিয়া শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব শিষ্যের মোহাপসারণে কহিলেন—

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো,
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালং।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখাব্ধৌ,
সন্তাপ সংস্থৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। রে ভ্রান্ত (মূঢ়, অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মাসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরূপয়া মায়য়াভিভূত) কথং হি (কেন হেতুনা) ভোগবিষয়েষু (রূপরসাদীন্দ্রিয়ার্থেষু) রক্তঃ (আসক্তঃ সন্) মোহংগতো দীর্ঘকালং (বারং বারং) বর্ত্মনি (সংসারে) ভ্রমসি? যদি অনিশং (নক্তন্দিবং) হি সুখাব্ধৌ (আনন্দবারিধৌ) বিশ্রান্তি-মিচ্ছসি (তদা) সন্তাপসংস্থৃতিহরং (সর্ব্বাশুভমূলভূতা-বিদ্যাধ্বান্তহরত্বাধ্যাত্মিকাদিতাপত্রিতয়হারিণং—জন্মান্তর নিরোধকরং) রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্গুণ—শ্রবণ—বিচারণ-তদমল সত্ত্বময় বিগ্রহপ্রত্যয়ৈকতানতয়া সমুপাস্স্ব)।

অর্থ। হে ভ্রমান্ধমানব! এই অসার—অনিত্য রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে আসক্ত হইয়া মোহবশে

(বিবেকবুদ্ধিহীনের ন্যায় 'আমার—আমার' করিয়া) কেন তুমি এই দীর্ঘ সংসার-পথে গমনাগমন করিতেছ ? যদি সত্যই তুমি ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে অনন্ত-বিশ্রাম লাভ করিতে নিরন্তর বাসনা কর, তবে (যিনি ত্রেতায় রামরূপে, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে, কলিযুগে বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যরূপে এবং ইদানীং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরাম-কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মগ্লানি বিদূরিত করিলেন) সেই সর্ব্বদুঃখান্ধকার ও পুনর্জ্জন্মনাশকারী ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর।

দীপিকা। (১) **রে ভ্রান্ত**—হে ভ্রমান্ধ মানব ! —অর্থাৎ নিত্য-শুদ্ধ-আত্মাকে অনিত্য—অশুচিজ্ঞান-কারি,—অথবা অনিত্য অশুচি দুঃখ তাপকেই নিত্য—পবিত্রভোগ্য-ভ্রমকারি !'—এরূপ সম্বোধন মানবের প্রতি করা হইয়াছে। * * এক্ষণে ভ্রম কি ? না,—মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ যাহা নিত্য নয়,—যাহার অস্তিত্ব নাই,—যাহা শুদ্ধ নয়, তাহা নিত্য বা তাহাকে অস্তিত্ববান—শুদ্ধজ্ঞান করার নামই ভ্রম। বেদান্তকার ইহাকে 'মায়া' বা 'অবিদ্যা' আখ্যা দিয়াছেন। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানতুল্য অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞান করার নামই মায়া বা অবিদ্যা ;—সংসার বা সৃষ্টি—যাহা আপাত-

সত্য,—কিন্তু বস্তুতঃ সত্ত্বাহীন, তাহাকে নিত্য বা সত্য বলিয়া ধরার নামই মায়া।

মায়াকে দ্বৈতজ্ঞান বা ভেদবুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। মানুষ নিজেকে হীন—বদ্ধ—সামান্য—শক্তিহীন 'জীব' বলিয়া মনে করে,—কিন্তু বেদান্ত বলেন—'জীবো ব্রহ্মৈবনাপরঃ'—(জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নয়)—'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই ব্রহ্ম) 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়) ইত্যাদি। রজ্জুতে সর্পভ্রমতুল্য জগৎ বা সৃষ্টি অধ্যাসমাত্র বা বিবর্ত্তাধিষ্ঠান। সর্প ভ্রম মাত্র,—রজ্জুই যেরূপ সত্য ;—চিদাত্মারূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত,—এই জগদ্‌ভ্রম বিদূরিত হইলে—সৎস্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেরূপ অবশিষ্ট থাকেন। তবে আমরা যে জীব বুদ্ধিতে ব্রহ্ম হইতে আপনাদের বিভিন্ন জ্ঞান করি, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। জল ও তরঙ্গ যেরূপ অভেদ,—মাত্র কম্পনের পার্থক্য,—কম্পন বিদূরিত হইলে যেই জল তাহারই তরঙ্গ বা জল থাকে,—জলের কম্পনরূপ অহং বুদ্ধি জন্যই সেরূপ আমরা ব্রহ্ম হইতে নিজেদের ভিন্ন জ্ঞান করি,—অহং বা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে দ্বৈত-জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং তখন ঠিক্ ঠিক্ 'একামেবাদ্বিতীয়ং' প্রতীত হয় ;—

কারণ অহং বা দ্বৈতজ্ঞানই হইতেছে স্বপ্নসদৃশ ভ্রান্তি,—এই ভ্রান্তির নাশেই মিথ্যাভূত সমস্ত দ্বৈতমূর্ত্তি-সংসাররূপ মহাস্বপ্নের অবসান হইয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন; সেজন্য আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"যথা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং—স্বয়মেবাবশিষ্যতে; তথৈব ভ্রান্তিমূলসংসারমহাস্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে।"

তন্ত্রে শিব ও শক্তির উল্লেখ আছে; শিব নির্গুণ—নিষ্ক্রিয়—সাক্ষী ও দ্রষ্টাস্বরূপ, তাঁহারি বক্ষে দিগম্বরাবেশে নৃত্য করিতেছেন 'শক্তি'। ঐ শক্তিই সৃষ্টি,—অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবন ও চরাচরের রচয়িত্রী,—তাই বেদান্ত উহাকে পুরুষেরই কার্য্যশক্তি—'মায়া' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উহার সংজ্ঞানির্ণয়ে আচার্য্যদেব শঙ্কর বলিয়াছেন—

"অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি—
রণাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া,
যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥"

অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরশক্তিই অনাদি অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্ব—রজস্তমোগুণান্বিতা) পরমা মায়ার কার্য্য (শক্তি) দ্বারা সুধীগণ কর্তৃক অনুমেয়া হন। সেই মায়া দ্বারাই এই নিখিল জগৎ উদ্ভূত। শক্তিমান (পুরুষ) সাক্ষীস্বরূপে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া তাঁহারই—'সর্প ও সর্পের বিষের' ন্যায় অভিন্নশক্তির পরিচালনায় ভুবনাদি প্রজাগণ সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রকার ঐ কথার প্রতিধ্বনিতে তাই বলিয়াছেন—"ঈক্ষতের্ণা-শব্দম্ [ব্রঃ, সূঃ ১।১।৫]

সাংখ্য পরিকল্পিত প্রধান বা তন্ত্রোক্ত শিব হইতে (লীলায়) ভিন্ন—শক্তি বা 'কালী' সৃষ্টির কারণ নয়, বস্তুতঃ ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ' বা তেজই সৃষ্টির মূল কারণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

গীতা। ৯ অঃ ১০।

—অর্থাৎ প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতার বশেই এ সচরাচর বিশ্ব প্রসব করে; হে কৌন্তেয় ! এই কারণেই জগৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। শ্রুতিও বলিতেছেন

—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত।
[ছাঃ ৬।২।৩] অথবা "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ম্।" [ছাঃ ৬।২।১] —হে সৌম্য! অগ্রে—অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র 'সৎ'—এক এবং 'অদ্বিতীয়ই' ছিলেন। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে—দ্বৈতকল্পনাই ভ্রমমাত্র, —শক্তিমান ও শক্তি একই, নামরূপের ভেদমাত্র! *

কিন্তু বিচার করিলেই ঐ ভ্রম বা মায়া,—যাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমস্বরূপ, অন্তর্হিত হয়, যথা—"রজ্জাব-

---

* এসম্বন্ধে একটী সঙ্গীত আছে, প্রদত্ত হইলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গানটী পুরুষ ও প্রকৃতির অভেদত্ব প্রতিপাদক; যথা—

(আমার্) মাকে ডাক্ হরি বলে।

যেই ব্রহ্ম সেই শক্তি,	—বেদবেদান্ত
পুরুষ বিকৃতি শক্তি,	কালী যে মূলা প্রকৃতি,
ভেদ নামরূপতলে,	অভেদ সব্ জ্ঞানানলে॥
অন্ধ! আঁখি খুলে হের	চিদঘন রূপ মা'র
সলিলে তুহীনময়ী'যে,	সন্তান-ভকতি বলে;
সলিল তরঙ্গ যেমন্,	ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন তেমন্,
জ্ঞানে অভেদ্ নাই কিছু ভেদ্,	সবই একাকার জলে॥

হিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পো নান্যৎ কিঞ্চিদপি, তথা অবিবেকভ্রমে নিবৃত্তে তদনন্তরং মিথ্যেতি জ্ঞায়তে।” ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—যেমন ভূতগ্রস্থ ব্যক্তি যদি আপনাকে ভূতে ধরিয়াছে বুঝিতে পারে, তবে ভূত আর থাকে না, সেরূপ মায়াকে জানিলে আর মায়া থাকে না। এ’সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুন্দর গল্প আছে, যথা—‘এক ব্রাহ্মণ বহুদিন পরে তাঁহার শিষ্যবাটী যাইতে মনস্থ করিলেন, কাজেই তাঁহার দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য অন্য কাহাকেও না পাইয়া এক মুচিশিষ্যকে সঙ্গে লইলেন এবং আত্মসম্মানের ভয়ে মুচিকে কোন কথা বা পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াদিলেন। তথাস্তু; ব্রাহ্মণ শিষ্যবাটী উপস্থিত হইলেন, শিষ্যটী বহির্মণ্ডপে বসিয়া রহিল। বহুদিন পরে গুরুদেব আসিয়াছেন, শিষ্যবর্গের মহলে ধূম পড়িয়া গেল; সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে ছুটিল এবং সম্মুখে মুচিভায়াকে দেখিয়া গুরুদেবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মহাবিভ্রত; শিষ্যটী প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির হইয়াও কাহাকে কিছু না বলিয়া ভয়ে—সন্তর্পণে নীরব রহিল। কথা নাই, সকলেই রুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়; অবশেষে আচরণ দেখিয়া

ক্রোধে একজন বলিয়াই ফেলিল—'আরে ব্যাটা যেন মুচি';—অর্থাৎ মুচির ন্যায় নীচ আচরণ। কিন্তু 'উল্টা বুঝিলু রাম';—মুচি ভাবিল—এইত! আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে?',—আর যায় কোথা! দিল এক দৌড়; থাম্—থাম্,—আর্ থামে কে? একেবারে অদৃশ্য।

—মায়াও ঐরূপ; মায়াকে জানিলে আর মায়া থাকে না। সেজন্য সর্ব্বদুঃখের ও সংসারভ্রমণের মূলকারণ এই অনর্থ মায়াকে দূরীকরণ সঙ্কেতেই মায়াবদ্ধ মানবের প্রতি—'রে ভ্রান্ত!' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বলিতেছেন—**'কথংহি'**—অতএব কেন তুমি সেই—

(২) ভোগবিষয়েষু।—ভোগের বিষয়ে, অর্থাৎ রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়সুখভোগে—ইত্যাদি। * *সংসার বাসনা চরিতার্থের স্থান,—এজন্য ইহাকে ভোগভূমি বলা হয়। **শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি ভোগ্যবস্তুকে উপভোগ করিবার ইচ্ছা লইয়া আমরা—**

"বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনাত্বগাখ্যানি।
বাক্ পানি পদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি—॥"

—এই একাদশ ইন্দ্রিয় বা করণ সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ সকল ভোগ্যবস্তু অনিত্যজাত মিথ্যা হইলেও আমরা মনে করি উহারা নিত্য এবং যথার্থ আনন্দদায়ী ;—কিন্তু শ্রুতি ইহাকে মিথ্যাভিধানই বার বার প্রদান করিয়াছেন। কারণ, শ্রুতি বলেন—ভোগ্যবস্তু বা করণ কখনও সত্যবস্তু হইতে পারে না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই—তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় ;—তবে তৎপশ্চাতে আত্মপ্রেরণাই যে—সে বিষয়জ্ঞান উৎপাদনের এক মাত্র কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যথা—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদংশ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপপাসতে॥
—কেনোপনিষৎ ৬।৭।

—অর্থাৎ লোকে যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না, পরন্তু যাঁহাদ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র ক্রিয়াশীল হয়,—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ইত্যাদি।

—অতএব দেখা যাইতেছে—করণের * পশ্চাতে আত্মারূপ আলোক রহিয়াছে বলিয়াই করণসমূহ তদালোকে আলোকিত হইয়া বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বাহ্য-চাকচিক্যে অভিভূত না হইয়া—তাহার মূল ব্রহ্মকে লক্ষ্য করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কারণ, বিচার করিলে আমরা দেখি যে, মৃত্যুর পর দৃশ্য ও করণনিচয় বর্ত্তমান সত্ত্বেও আত্মার অভাবে তাহা ক্রিয়াশীল হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব

* সাংখ্যমতে এই করণোৎপত্তি 'প্রকৃতি' হইতে হয়, যথা—

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ ২২॥

—অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং তাহা হইতে ষোড়শসংখ্যকতত্ত্ব জন্মে (যথা—একাদশ ইন্দ্রিয়+পঞ্চতন্মাত্র) ইত্যাদি। তৎপরে 'করণের' অর্থ সঙ্কেতে বলিতেছেন—"করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকম্॥" [সাংখ্য। ৩২] —অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কার —এই তেরটী করণ নামে খ্যাত। —অর্থাৎ যাহা দ্বারা কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, তাহাই 'করণ' নামে অভিহিত।

সেগুলিকে নিত্য ও শুদ্ধজ্ঞান করাই ভ্রমমাত্র ! শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সেজন্যই উক্ত অনিত্য দ্রব্যে নিত্যভাবনারূপ ভ্রমকে দূরীকরণকল্পেই বলিতেছেন—হে ভ্রমান্ধ মানব ! অনিত্য ভোগ্যবস্তুতে কেন তুমি—

(৩) **রক্তঃ** :—আসক্ত ? আসক্ত বিশেষণ, ইহার বিশেষ্য—আসক্তি। আসক্তি বাসনা হইতে জাত এবং বাসনাই সংসার-সৃষ্টিকারী—যত দুঃখের মূল ! অতএব 'এরূপ আসক্তি অতীব হেয়',—এরূপ অর্থেই 'রক্তঃ' শব্দ ব্যবহৃত। তৎপরে, জ্ঞানবিমুখ ভোগ-বাসনায় প্রমত্ত মানবের আর কি কি ভ্রান্তি সঙ্কেত করিতেছেন—

(৪) **মোহং গতো।**—অর্থাৎ মোহপ্রাপ্ত বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া। মোহ কাহাকে কহে ? পুরাণকার বলেন—

"মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

—অর্থাৎ 'আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার গৃহ'—এরূপ যে 'আমার—আমার'জ্ঞান,—ইহার নামই 'মোহ'। যাহা 'আমার' অর্থাৎ সত্য নয়, তাহাকে

'আমার' বোধ করার নামই মোহ বা অবিদ্যা। *
বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"কৃশোঽতি দুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপদাদিমানহং।
ইতি ভাবানুরূপেন ব্যবহারেণ বধ্যতে॥

—অর্থাৎ 'আমি অতি দুঃখী, আমি বদ্ধ, আমি কৃশ, আমি হস্তপদাদিযুক্ত জীব'—এই ভাবানুরূপ ব্যবহারেই মানুষ মোহ প্রাপ্ত হয়।

আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—'কল্পিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্ম-ন্যাত্মভাবনাৎ।' —অর্থাৎ অনাত্ম-বস্তুতে আত্মভাবনা-দ্বারা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি 'অবিদ্যা' কল্পনা করিয়া থাকে। তাহারা এই নশ্বর শরীরকেই সর্ব্বস্বজ্ঞানদ্বারা নাস্তিক—

* গীতার শ্রীকৃষ্ণও এই মোহের সংজ্ঞানির্ণয়ে বলিয়াছেন—যাহারা—

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তিসদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥"

গীতা। ১৬।১৫।

—অর্থাৎ 'আমি ধনবান, আমি সৎকুলে প্রসূত, আমার তুল্য আর অন্য কে হইতে পারে? আমি যাগ করিব, দান করিব এবং আনন্দভোগ করিব';—এই প্রকার অজ্ঞানের দ্বারা [মনুষ্যগণ] বিমোহিত হইয়া থাকে॥

চার্ব্বাক মতের পরিপুষ্টি সাধন করে। চার্ব্বাক বলেন—স্থূলোঽহং, কৃশোঽহং ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ স্থূল-শরীরমাত্মেতি।" —অর্থাৎ 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' বলিতে এই স্থূল শরীরকেই আত্মা বোঝায়; —অশরীরী আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,—দেহের ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস হয় ইত্যাদি। কিন্তু, বস্তুতঃ বিচারদ্বারা দেখা যায়—"ইদং শরীরং দৃশ্যং জড়মনিত্যম-মঙ্গলং"—এই শরীর দৃশ্য, জড়, অনিত্য ও অনর্থের নিদান। নিত্য বস্তু এক,—শরীরাতিরিক্ত ও অদ্বিতীয় এবং শ্রুতি বলিতেছেন—সেই নিত্য বস্তুই হইতেছেন—'আত্মা'; তাঁহাকেই একমাত্র ধ্যেয় ও প্রাপ্তব্য বস্তু বলা যাইতে পারে; যথা—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহ ২।৪।৫]

শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র, ইহা আত্মা নহে, অতএব—আত্মেতর ও নশ্বর। যোগবাশিষ্ঠকার সেজন্য বলিয়াছেন—

"নাহং দুঃখী ন মে দেহো, বন্ধঃ কস্যাত্মন্যিস্থিতঃ।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণমুচ্যতে॥"

—অর্থাৎ 'আমি দুঃখী নহি, আমার দেহ নাই,—কি হেতু আমাতে বন্ধন আছে?' —এই প্রকার

ভাবানুরূপ ব্যবহারেই মানুষ মোহ হইতে মুক্ত হয়, —নচেৎ দেহ-বুদ্ধি বন্ধনেরই কারণ হয়। মানুষ যে 'আমার পিতা,—আমার পুত্র' ইত্যাদি জ্ঞান করে, তাহা অজ্ঞানবশতঃ ;—কিন্তু অজ্ঞান দুঃখদায়ক, অতএব ইহার আবরণ চিরমুক্ত করা কর্ত্তব্য! বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

"পুত্রাঃ সন্তি ধনং মেঽস্তি, ইতি বালো বিহন্যতে।
আত্মা চ হ্যাত্মনো নাস্তি, কুতঃ পুত্রঃ কুতো ধনম্ ॥"
—ধর্ম্মপদম্। বালবর্গঃ—৩।

—অর্থাৎ 'আমার পুত্র আছে,—আমার ধন আছে' —এই মনে করিয়া অজ্ঞেরা বিনষ্ট হয়; আত্মাই (শরীরাদিই) যখন আপনার নয়, তখন পুত্র বা ধন কোথায় থাকিবে?'—অতএব এই সংস্কারগত মহামৃত্যু-রূপ আত্মমোহকে জয় করিতে হইবে এবং আচার্য্য শঙ্করের সেই অপূর্ব্ব বিচারবুদ্ধিযুক্তবাণী—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্যত্বং কঃ কুতআয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাত ॥"

—সতত চিন্তা করিতে হইবে। এই সংসার বা মহামায়ার খেলা অতীব বিচিত্র। অতএব, আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিতে হইবে—'আমি কে? আমি কাহার? কোথা হইতে আমি আসিয়াছি? মৃত্যুর পর আবার কোথায়ই বা যাইব?'—ইহাতে ফল এই হইবে যে, যুগপৎ হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে ও মোহ বিদূরিত হইবে। ইহা যে বন্ধন এবং জীবত্বের শৃঙ্খলমাত্র, ইহার পরিকল্পনায়ই এই "**মোহং গতো**" শব্দ অজ্ঞান বারণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ, মোহগ্রস্থ অজ্ঞানীই—

(৫) **দীর্ঘকালং**—বারংবার বহুজন্ম যাতায়াত করিয়া * *। 'দীর্ঘকালং'—এই শব্দ দ্বারা পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। যতদিন না মানুষ তাহার স্ব স্বরূপ স্বয়ংজ্যোতি আত্মাকে জানিতে পারিতেছে, ততদিন তাহাকে বাসনার জন্য কৃতকর্ম্মের ফলভোগার্থ বারংবার জগতে আসিয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, কারণ—"কর্ম্মভ্যঃ শরীর পরিগ্রহো জায়তে। শরীর পরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে।" ইত্যাদি।

জড়বাদী পাশ্চাত্যদেশবাসীরা কিন্তু পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—'দেহের নাশেই

আত্মার নাশ হয়'—যাহা চার্ব্বাকের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে—'বাসনা থাকা পর্য্যন্ত তাহাদের পুনঃ পুনঃ জগতে আসাযাওয়া করিতেই হইবে।' শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী তাঁহার 'Reincarnation' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—'Our bodies may change (decayed) but the powers, karma, Samaskaras or impressions and the materials which manufactured our bodies, must remain in us in an unmanifested form." এই unmanifested formই হইতেছে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ। এই লিঙ্গদেহ বাসনানুযায়ী পুনরায় স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

পুরাণকারগণ বলেন—আমরা মনুষ্যদেহ লাভ করিবার পূর্ব্বেই বহুবার জন্মমৃত্যুচক্রে পতিত হইয়াছি।—অর্থাৎ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ—এই চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর ধারণ করিয়া আমাদের অশীতি লক্ষ (৮০,০০,০০০) বার এই জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে ও তৎপরে—বর্ত্তমান এই মনুষ্যদেহ লাভ

করিতে সক্ষম হইয়াছি। ক্রম বিকাশবাদীর মতে মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠজন্ম; কারণ—উদ্ভিজ্জ চেতনাবিশিষ্ট হইলেও সেই চেতনা মূর্ত্তাকারে প্রকাশ করিতে তাহারা পারে না,—সেজন্য সাধারণতঃ তাহাদের জড় ও স্থাবর বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ—স্বেদজ ও অণ্ডজ কর্ম্মশক্তিমান (active) ও জীবন-যাত্রায় যুদ্ধকরণে (Struggle for Existence) প্রাণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিলেও তাহাদের মধ্যে পাশবিকশক্তিরই (পশুত্ব) একমাত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সদসৎ বিবেকবুদ্ধি বা দেবত্ব (Rationality) তাহাদের থাকে না। তৎপরে—জরায়ুজ ও পশু প্রভৃতিতে ঐ দেবত্ব সুপ্তাবস্থায় থাকে,—জাগ্রত (manifested) নহে; কিন্তু—মানবে ঐ দুইশক্তিই (পশুত্ব ও দেবত্ব) বর্ত্তমান থাকে এবং সে ঐ দেবত্ব দ্বারা ক্রমশঃ পশুত্বটীকে বিনষ্ট করিয়া মনুষ্য-জীবনের চরমোৎকর্ষ—শান্তিলাভে জন্মমৃত্যু পাশ ছিন্ন করিতে পারে। তবে—তাহাও সময় সাপেক্ষ এবং ঐরূপ শান্তিলাভেরও ইচ্ছা সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন করে, যথা—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

—অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ হয়ত মুক্তির জন্য যত্ন করে এবং সহস্র সহস্র যত্নশীল মানবের মধ্যে হয়ত কেহ যথার্থরূপে আমাকে (আত্মাকে) জানিতে পারে। কিন্তু—তাহা হইলেও "জন্তুনাম্ নরজন্ম দুর্লভং" ; ইচ্ছা করিলে সে তাহার স্বরূপাবধারণ করিয়া মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ, স্বভাববশতঃ মানুষ পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের মত বাসনা চরিতার্থের আশায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ প্রহেলিকায়ই পতিত হইয়া থাকে। "দীর্ঘকালং" এখানে ঐরূপ বিস্মৃতিময় গমনাগমনের নিন্দাসূচনার্থেই লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে—'দীর্ঘকালং ভ্রমসি',—পুনঃ পুনঃ কেন ভ্রমণ করিতেছ ? কিন্তু, প্রশ্ন হইতে পারে—'কোথায়' ?—তদুত্তরে তাই বলিতেছেন—

(৬) **বর্ত্মনি।**—অর্থাৎ সংসারে। 'বর্ত্মনি' অর্থে এখানে সংসার বা জগৎ বুঝাইতেছে। ইহা বলিবার আরও উদ্দেশ্য এই যে—পথিক যেমন পথকে চিরস্থায়ী বাসস্থান ভাবিয়া বসিয়া থাকে না,—পরন্তু যাতায়াতের জন্যই মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, মানবগণও সেরূপ এ সংসারে কিছুকালের জন্য কর্ত্তব্য পালনে অথবা কর্ম্মজন্য আসিয়া থাকে, কর্ম্মশেষে পুনরায় চলিয়া যায়

সংসারকে পুনঃ রঙ্গমঞ্চের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে। আমরা সকলে এ রঙ্গমঞ্চের নট ও নটী। রঙ্গালয়ে নট ও নটীগণ যেমন ক্ষণকালের জন্য রাজা ও ভিখারী,—মাতা ও পুত্র প্রভৃতি সাজিয়া অভিনয় প্রদর্শন করেন, আমরাও সেরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কেহ মাতাপিতা,—কেহ পুত্র-কন্যাদি সাজিয়া এই সংসাররঙ্গভূমে অভিনয়কার্য্য করিতেছি। যথা—

রঙ্গমঞ্চ ভবের মাঝে,
নট নটী সবাই সাজে,
খেলা শেষে সজ্জা ত্যজে—
চলে চির আপন ঘরে।

—অতএব এ সংসার প্রপঞ্চময়! দ্বিতীয়তঃ—'জগৎ' এই শব্দের বিশ্লেষণে দেখা যায়—'গচ্ছতীতি জগৎ',—যাহা অস্থায়ী, নিয়তই গতিশীল, তাহাই 'জগৎ' নামে অভিহিত। অনন্ত কালাভিমুখে ইহার গতি, অথবা যাহা গত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে;—যাহা থাকিবার নয়, তাহাই জগৎ। ইহা কালনাশ্য! মহাপ্রলয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালকুক্ষিগত হইবে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে পুনঃ লীন হইবে, ইহার

কিছুই থাকিবে না। বকরূপী ধর্ম্ম, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যখন জগতের প্রকৃত তথ্য বা ব্যাপার—"কা চ বার্ত্তা?" —'জগতের সমাচার কি?' জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির তখন বলিয়াছিলেন—

"মাসর্ত্তু দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি দিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে—
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"

—অর্থাৎ কাল কর্ত্তারূপে মোহময় সংসার-কটাহে ঘোটনকারণ মাস ও ঋতুরূপ হাতার সাহায্যে সূর্য্যরূপ অনলে, রাত্রিদিবারূপ কাষ্ঠ সংমিশ্রনে যাবতীয় ভূতগণকে পাক করিতেছে,—ইহাই বার্ত্তা।—অর্থাৎ জগতের কিছুই স্থায়ী নয়, অনিত্যতাই জগতের সত্য সমাচার।

তৃতীয়তঃ—জগতকে পুনরায় জল প্রবাহের সহিত তুলনা করিতে দেখা যায়। একটি প্রবাহ চলিয়া গেল, আবার একটি আসিল, তাহাও চলিয়া গেল,— এইরূপে অনন্ত ধারা যেরূপ চলিতেই থাকে, বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান জগৎও সেরূপ নিত্য নয়, সদাই পরি-

বর্ত্তনশীল! তৎপরে—ইহা সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং ইহার লয় আছে। যুগ যুগ ধরিয়া সৃষ্টি ও লয়ই ইহার ধারা, এজন্য শাস্ত্র জগতকে "প্রবাহাকারে নিত্য" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুণ্ডকভাষ্যে পরাবিদ্যার অর্থকরণে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—'কর্ত্ত্রাদিসাধনক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোহনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাৎ হাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপসম্বন্ধঃ।" —অর্থাৎ নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান, —ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন এবং কর্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াফলাত্মক, ভেদপূর্ণ—অনাদি—অনন্ত (১) ও দুঃখময় এই যে সংসার ইত্যাদি।

জীব এই কুরুক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সংসার-সমরাঙ্গনে আসিয়া অর্জ্জুনের তুল্য স্বভাববশে সংসার অনিত্য জানিয়াও সতত কর্ম্মসংগ্রাম করিতেছে; যথা —"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"—কিন্তু

---

(১) 'অনন্ত' এজন্য যে—সংসার অনিত্য হইলেও, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও, কখন যে ইহার শেষ হইবে,—তাহা সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট না থাকায়,—'সংসারকে' 'অনন্ত' বলা হয়।'

কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মক্ষুধা মিটিতেছে না, সেজন্য ভ্রান্তিপূর্ণ এই সংগ্রাম বা সংসারবর্ত্মে ভ্রমণের প্রতিষেধকল্পে শ্লোকে বলা হইয়াছে—"বর্ত্মনি ভ্রমসি"। কিন্তু—'যদি অনিশং"—দিবারাত্রি অথবা নিরন্তর 'হি' নিশ্চিতরূপে—

(৭)—সুখাব্ধৌ।—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ সাগরে * * গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই 'সুখের' সংজ্ঞানির্ণয়ে বলিতেছেন—

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতিতত্ত্বতঃ॥"

—গীতা।৬অঃ—২১

—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে,—যাহা অনন্ত এবং একমাত্র সমাহিত বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য, অথবা যে সুখ কোন প্রকার বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল বুদ্ধিদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে, সেই সুখকে ইত্যাদি। এক্ষণে, সে সুখ কি? না—আত্মস্বরূপে অবস্থিতি! তাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"—অর্থাৎ যাহাকে লাভ করিয়া অন্য কোন লাভকেই তাহা হইতে অধিক বলিয়া

মনে হয় না,—তাহাই ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দানু-ভূতিকেই যথার্থ 'সুখ' সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। যথা—

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অর্থাৎ প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ও ব্রহ্মদৃষ্টিযুক্ত ও আত্মসমাধিনিরত যোগীই (একমাত্র) অনায়াসে ব্রহ্মসংস্থ হইয়া নিরতিশয় 'সুখ' লাভ করিয়া থাকে। তৎপরে বলা হইয়াছে—"শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ। [গীতা ১৪ অঃ ২৭]—অর্থাৎ 'শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখেরও 'আমি' প্রতিষ্ঠা।' এখানে—'আমি' শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন; —সুতরাং 'আমি' অর্থে 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মই' স্থির বুঝিতে হইবে। অতএব 'সুখ' অর্থে 'ব্রহ্মাবস্থিতিই' সত্য।

এই 'সুখ' সংজ্ঞার অভিধানে বিভিন্ন শাস্ত্রকার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। যথা, কেহ বলিতেছেন—ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, কেহ বলিতেছেন—পুরুষ ও প্রকৃতির সম্যকজ্ঞানদ্বারা

পুরুষে অবস্থিতি, আবার কেহ বা বলিতেছেন—প্রকৃতি বা মায়াকে পুরুষেরই অভিন্ন বিকাশ ভাবিয়া, শাখাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অথবা তৎপ্রতি অনিত্যজ্ঞানের আরোপে—অদ্বিতীয় পুরুষ বা ব্রহ্মেই আপন সত্তা পর্য্যবসিত করা ইত্যাদি। বস্তুতঃ, যিনি যাহাই বলুন, জন্ম-মরণাদি দুঃখ-নিবৃত্তিতেই—সকল দর্শন-কারের লক্ষ্য দৃষ্ট হয়; সুতরাং—জন্মমরণ-প্রবাহ অথবা মায়িক-অধ্যাস বিলোপে—যথার্থ স্বরূপে অবস্থিতি দ্বারাই সুখ বা শাশ্বতশান্তি অধিগত হইয়া থাকে।

এই 'সুখ' আবার ত্রিবিধ। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্॥"

—গীতা।১৮ শঃ অঃ—৩৬।৩৭

—অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারকসমূহের সত্ত্বাদিগুণত্রয়ভেদে সুখ তিন প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে অভ্যাসবশতঃ যে

সুখে আসক্তি ও প্রীতি হয়, যাহার অনুভবে (সকল) দুঃখের অবশ্যম্ভাবী উপশম প্রাপ্তি ঘটে,—প্রথমতঃ যে সুখ দুঃখাত্মক বলিয়া প্রতীত হইলেও পরিশেষে জ্ঞান বৈরাগ্যের পরিমাপক হইয়া অমৃততুল্য প্রতিভাত হয়, সেই আত্মবুদ্ধির প্রসাদাতিশয় সুখই—সাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাত। আর—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥"

—যে সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সহকারে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে অমৃততুল্য প্রতীত হয় ও পরিণামে বিষতুল্য হইয়া বল, বীর্য্য, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহকে বিনষ্ট করে এবং অধর্ম্ম ও তজ্জনিত নরকাদিগমনরূপ দুঃখের কারণ হয়, তাহাই 'রাজস' সুখ বলিয়া কথিত। তৎপরে—

"যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥" ৩৯॥

—যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমে ও শেষে আত্মমোহকর হইয়া থাকে,

তাহাই 'তামস' সুখ নামে অভিহিত।—কথিত এই ত্রিবিধ সুখের হাত হইতে দেবতাগণের পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নাই; সকলকেই এই তিনের মধ্য দিয়া তবে ব্রহ্মানন্দসাগরে উপস্থিত হইতে হয়।

'সুখের' পরই আসিতেছে—'দুঃখ'। কায়াকে ছাড়িয়া ছায়া,—আলোককে ছাড়িয়া অন্ধকার যেরূপ থাকিতে পারে না,—একের পরেই অপর আসিয়া উপস্থিত হয়; সুখের পরও সেরূপ 'দুঃখ' কথাটি আসিয়া প্রতিভাত হয়। দুঃখ বলিতে বুঝি আমরা সুখেরই ঠিক্—বিপরীতার্থ;—অর্থাৎ স্বরূপচ্যুত হইয়া শরীরাভিমানে জাগতিক ভোগসুখরূপ কণ্টকাঘাতে জর্জ্জরিত হওয়া। ভ্রমে যাহাকে জল বলিতেছি, নিকটে যাইয়া দেখিতেছি—তাহা মরীচিকা এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্রুনেত্রে উত্তপ্ত বালুকায় মাথা রাখিয়া—প্রতিক্ষণ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি;—কিন্তু তথাপি কি জলের আশা আমরা ত্যাগ করিতেছি? মৃত্যুর দ্বারেও কাল্পনিক—অনিত্য সুখছায়া দর্শন করিয়া হাসিতেছি, আবার পরক্ষণেই হতাশ হৃদয়ে কাঁদিতেছি—ইহার নামই দুঃখ। এই দুঃখের অন্ত করিতে হইলে—ভ্রমকে বিচারপূর্ব্বক দূর করিতে হইবে এবং

'ব্রহ্মই বস্তু—আর সব অবস্তু',—এই অবস্তুর পার্শ্বে যে বস্তু রহিয়াছে, তাহাই আমার স্বরূপ',—এই জ্ঞান লইয়া যথার্থ শান্তির দিকে ছুটিতে হইবে, তাহা হইলেই বোধে বোধ হইবে যে—'ব্রহ্মানন্দ-সাগরের মীন আমি অথবা 'সোহহং',—আমিই সেই।' শ্লোকে "সুখাব্ধির" সত্যার্থ ইঙ্গিতে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব বলিতেছেন—'যদি সেই শ্রেয়োরূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে—

(৮) **বিশ্রান্তিমিচ্ছসি।** —বিশ্রাম লাভ করিবার বা শান্তিলাভের যদ্যপি ইচ্ছা কর,—অর্থাৎ মুমুক্ষুতঃ। * * এক্ষণে শান্তি কি? না—পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে—জন্মমৃত্যুপাশ ছেদন। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? —সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যুর জনক—বাসনার ধ্বংস দ্বারা। বেদান্ত বলেন—শান্তির অর্থই হইতেছে স্বস্বরূপ যে 'আত্মা,—তাঁহাকে অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি'—এই রহস্যটী বিদিত হওয়া। 'অহং'-বোধরূপ মায়াদ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত রহিয়াছে, 'অহং' এর ধ্বংস হইলেই—'আমি চিন্ময়, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব আত্মা, আমি সুখদুঃখ—জন্মমৃত্যুরূপ দ্বন্দ্বাতীত'—এই জ্ঞান উদিত হয়।

এক্ষণে, ঐ স্বরূপোপলব্ধির যে তীব্র ইচ্ছা, তাহার নামই 'মুমুক্ষুত্বং'। বিবেকচূড়ামণিকার আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতং দেবানুগ্রহ হেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥"

—অর্থাৎ এ'জগতে তিনটি জিনিস বড়ই দুর্লভ (১) মনুষ্যত্বং (২) মুমুক্ষুত্বং (৩) মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে একই জীবনে এই তিনের একত্র সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ দেখা যাউক 'মনুষ্যত্বং' কাহাকে বলে ?

(১) মনুষ্যত্বং—অর্থাৎ মানবের মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব *—এই দুইটি শক্তি বর্ত্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে একটি অজ্ঞান ও অপরটি জ্ঞানস্বরূপ। দেবের খড়্গে অজ্ঞানরূপ পশুত্বটিকে বলি দিলে—এই মনুষ্যই দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'মান্‌হুঁশ',—অর্থাৎ স্ব উদ্দেশ্যে যিনি সচেতন ও লক্ষ্যবান এবং আপন জীবত্বটুকু সরাইয়া যিনি

* দেবত্বার্থে শুদ্ধ সত্বগুণ ও পশুত্ব অর্থাৎ রজস্তমোগুণকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনিই ঠিক্‌ঠিক্ মনুষ্য পদবাচ্য, অন্যথা পশুতুল্য।

(২) **মুমুক্ষুত্বং**—মুক্ত হইবার ইচ্ছা; অর্থাৎ—"পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ পাশমুক্তো সদা শিবঃ।"—এই রহস্য অবগত হইয়া যিনি মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া জীবভাব বিস্মৃত ও শিবভাব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই মুমুক্ষু। বস্তুতঃ, মুমুক্ষু তাঁহাকেই বলা যায়,—যাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রতি প্রচেষ্টা মুক্তিলাভের আবেগময়ী প্রেরণায় পূর্ণ!

(৩) **মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ**—সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও কৃপা। সৎ+গুরু=সদ্‌গুরু;—কিন্তু গুরু শব্দের অর্থ কি? নিত্যতন্ত্রকার ১৮শ পটলে বলিয়াছেন—

" 'গ'কারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্যহারকঃ
'উ'কারো বিষ্ণুরব্যক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ॥"

—অর্থাৎ 'গ'কারার্থে সিদ্ধিদাতা—যিনি সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করেন;—'র'কারার্থে সর্ব্বপাপ বা অজ্ঞান বিনাশকর্ত্তা এবং 'উ'কারার্থে সাক্ষাৎ অব্যক্ত বিষ্ণু বা ব্রহ্ম। অতএব, 'গুরু' বা মানবের অজ্ঞাননাশকারী জ্ঞানদাতা যে সে ব্যক্তি হইতে পারেন না, পরন্তু—জ্ঞান যিনি

পাইয়াছেন,—সর্ব্ব অজ্ঞানতা যিনি বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানদানে শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে পারেন। শাস্ত্রে আছে—

"মনো মাতঙ্গরূপেণ জ্ঞানমঙ্কুশমেব চ।
তত্ত্বমসি নরস্তস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

—নিত্যতন্ত্রম ১৮শ পঃ

—মন (মত্ত) হস্তীতুল্য,—জ্ঞান তাহার অঙ্কুশ এবং 'তত্ত্বমসি' (তৎ+ত্বম্+অসি—তুমিই সেই ব্রহ্ম) এই জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানরূপ অঙ্কুশদ্বারা মনো-মাতঙ্গকে বশীভূত করিতে পারিলে, মানুষমাত্রেরই সমুদয় অজ্ঞানতারূপ পাপের ধ্বংস হয়। কিন্তু—"সর্ব্বেষাং ন চ বৈ বুদ্ধিস্তত্ত্বদৃষ্টৌ সমর্থিতা।"—অর্থাৎ সংসারে সকলেই আপনা আপনি প্রকৃততত্ত্ব বোধগম্য করিতে পারে না;—স্বয়ং ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপ হইলেও মায়াবরণজন্য সকলে তাহা জানিতে পারে না। ভূতে যাহাকে ধরে, সে জানিতে পারে না যে—তাহাকে ভূতে ধরিয়াছে; সেজন্য—তাহার যেরূপ ওঝার প্রয়োজন হয়, মায়াজাল ভেদ করিবার পথ-প্রদর্শকস্বরূপে গুরু বা আচার্য্যেরও সেরূপ প্রয়োজন।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিয়াছেন—"যাঁরা অধীত বেদবেদান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ,—তাঁরাই যথার্থ গুরু। তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে,—"নাত্র কার্য্যা বিচারণা।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবৈদিক—অশাস্ত্রীয় কুলগুরু প্রথা—স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছেন। বাস্তবিক, ব্রাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণেরা সমাজে শীর্ষাধিকার লাভ করিবার জন্য অপরাপর তিনবর্ণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্ম হইতে অধিকারচ্যুত করিয়া নিজেরাই মেরুদণ্ডস্বরূপে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকেন এবং ঐকাল হইতেই কুলগুরুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময় হইতেই মানুষের মনে একটি ছাপ পড়িয়া গিয়াছে যে—কুলগুরু ব্যতীত অপরকে গুরুপদে বরণ করিলে অনন্ত-নরকগামী হইতে হয় এবং সে জন্য গুরুগীতায় দেখিতে পাওয়া যায়—গুরুপুত্র, গুরুপত্নী অথবা যে কেহ গুরুবংশের—সকলেই গুরুরূপে বরেণ্য। (?) ইহা ব্যতীত—বিশ্বাসের মহিমা কীর্ত্তনে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, শিষ্য বলিতেছেন—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

—কিন্তু, বস্তুতঃ এই বিশ্বাস এবং সংস্কার কতদূর যে সত্য, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ!

নিত্যতন্ত্রকার উহার প্রতিবাদকল্পে একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"গৃহী গুরু ন কর্ত্তব্যো ন তরেত্ন তারয়েৎ।"

'গৃহী' অর্থে এখানে—যাঁহারা প্রতিক্ষণই স্ত্রীপুত্র, ধন ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ক্ষুদ্র 'অহং' গণ্ডির মধ্যে পড়িয়া মারামারি করিতেছেন—তাঁহারা। তাঁহারা বাসনার দাস ও মায়ায় অভিভূত হওয়ায়—শান্তিমার্গ স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারেন না, অপরকেও সেথা দিয়া চালিত করিতে সমর্থ হন না। অতএব, এই সমস্ত অন্ধ কর্ণধারগণের তরণীতে উঠিলে যে—দিশাহারা হইয়া 'মাঝ দরিয়ায়' ডুবিয়া মরিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া—
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

কঠ—১।২।৫

—অর্থাৎ অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনারাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে,—সেই বক্রগতি মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধ পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, —মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কবির দাসও এতদ্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যাকো গুরু হ্যায় আঁধারা, চেলা কাঁহা করায়।
অন্ধে অন্ধে ঠৈলিয়া, দোউ কূপ্ পরায়॥" *

—অর্থাৎ গুরুই যাহাদিগের অন্ধ, তাঁহার শিষ্যেরা কি করিবে? অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইয়া উভয়েই কূপে পতিত হয়।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেন,—'জনৈক সভাপণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞের ভান করিয়া কোন রাজার নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন। একদিন রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি ব্রহ্মজ্ঞ ও শাস্ত্রদ্রষ্টা এবং আমি আপনার শিষ্যতুল্য;—এক্ষণে আপনি

* অথবা বলিয়াছেন—
"অন্ধা গুরু অন্ধে চেলা,
দোনো নরকূমে ঠেল্লাম্ ঠেলা।"

আমার আত্মদর্শনের পথ প্রদর্শন করুন।' রাজা সামান্য দাম্ভিক ছিলেন, তাই বলিলেন—'এক সপ্তাহের মধ্যে ইহার মিমাংসা করিয়া না দিলে—আপনার মৃত্যুদণ্ড হইবে।' পণ্ডিত ভাবিয়াই অস্থির। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য শাস্ত্রপাঠ করেন,—পরমার্থের সন্ধান কখন করেনও না—জানেনও না; কাজেই বাটী ফিরিয়া দারুণ চিন্তায় কঙ্কালসার হইতে লাগিলেন। ক্রমে ছয় দিন অতীত এবং নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল, ব্রাহ্মণও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার এক বিদুষী কন্যা পিতার অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসায় সমস্ত অবগত হইল এবং পিতাকে বলিল—'চিন্তা করিবেন না, আমি ইহার সমাধান করিয়া দিব।" * * পরদিন প্রাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি পিতার সহিত রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া 'স্বয় মিমাংসার সমাধান করিবে'—ইহা নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বালিকার আদেশমত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে, বালিকার নির্দ্দেশানুসারে ব্রাহ্মণ ও রাজা উভয়কেই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হইলে—বালিকা পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধন মুক্ত করিতে বলিল;—

কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়েই এই বাক্য অসম্ভব বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন। তখন বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল—'হে রাজন্! আপনার আত্মদর্শনের পথ-প্রদর্শন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। পিতা আমার বিষয়াসক্ত—বাসনার দাস ও বদ্ধ, আর আপনিও তদনুরূপ;—সুতরাং বদ্ধ কখনও বদ্ধের বন্ধন মোচন করিতে পারে না। আপনার রজ্জু-বন্ধন খুলিতে যেরূপ মুক্ত একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন, এই ভববন্ধন মোচন করিতেও সেরূপ মুক্ত একজন তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য সাপেক্ষ।' বাস্তবিক—যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, তিনিই যথার্থ অপরের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে সমর্থ। তাই বলা হইয়াছে—

> বাঁধন্ যাহার পায়ের ভূষন্
> সেইত অন্ধ অন্ধকারে।
> বন্দী সে'ত বাসনার দাস
> সংসারের এই কারাগারে॥
> জ্ঞানের আলো পায়না যে'জন,
> খুলতে নারে সে'ত নয়ন,
> ধর সদ্গুরুর চরণ,
> অনায়াসে যাবে তরে॥

বদ্ধ থাকে বদ্ধ মতন,
সাধ্য কি তার খুল্‌তে বাঁধন ?
(সে) আপনি মজে পরকে মজায়,
জন্মমৃত্যুর ঘোর আঁধারে

'গুরু' শব্দের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—'গু' শব্দে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দে জ্যোতি,—অর্থাৎ যিনি অন্ধকারে আলোক সম্পাতে পথপ্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ গুরু। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ও শিষ্যকে অভয়দানকারী সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে মুক্তি লাভ করাই মানুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য, এ' অভিপ্রায়ে সংসার-তাপবিদগ্ধ মানবের দুঃখে বিগলিতচিত্ত আচার্য্যদেব সকলকে যথার্থ শান্তির অধিকারী করিবার জন্য বলিতেছেন—"সন্তাপসংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণং।" —'রামকৃষ্ণং'—অর্থাৎ যিনি 'রা' বা দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া 'ম' পূর্ণানন্দ প্রদান করেন ও 'কৃষ্ণং' অর্থাৎ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ বা তাপকে 'আকর্ষণ' করিয়া শাশ্বত শান্তি প্রদান করেন, সেই যুগজ্যোতিস্তম্ভ এবং 'সংসৃতি'—অর্থাৎ সংসার বা গমনাগমনযন্ত্রণার উচ্ছেদসাধনকারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে ভজনা কর, অর্থাৎ—তাঁহার অতিশয় নির্ম্মলচরিত্র শ্রবণ, মনন ও

নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বীয় রজস্তমোভাবকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সত্বময়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুদ্ধসত্বগুণছায়ায় আপনাকে পবিত্র ও মুক্তাত্মা করিয়া তুল।

এক্ষণে কথা হইতেছে ভজনাই বা করিব কেন এবং কাহারাই বা ভজনা করে? তদুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
গীতা। ৭অঃ ১৪।

অর্থাৎ—এই দৈবী ও গুণময়ী—আমার মায়া দুরতিক্রমণীয়া; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই এই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।' —এতদ্দ্বারা 'কেন আমরা ভজনা করিব'—ইহার উত্তর এইরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে যে—সংসারার্থেই 'মায়া' এবং 'সংসার অতিক্রম অর্থেই—মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি লাভকরা; সুতরাং—মায়া যাঁর, সেই মায়াধীশ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভজনা করার সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে।

তৎপর বলা হইয়াছে—ভগবানের ভজনা করে কাহারা ? ইহার উত্তরেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥” ১৬

—অর্থাৎ হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। আর্ত্ত (পীড়িত) জিজ্ঞাসু, ধনার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করেন। * এবং—

“যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥” ২৮

অর্থাৎ—যে সকল পবিত্রকর্ম্মা ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয়, সেই সকল দৃঢ়ব্রত (মহাত্মাগণ) দ্বন্দ্বমোহবিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।

---

* আচার্য্যদেব আর্ত্তাদির পরিচয়ে—ভাষ্যে বলিয়াছেন—“আর্ত্তঃ আর্ত্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাভিভূতঃ আপন্নো জিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যোঽর্থার্থী ধনকামো জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ।” —অর্থাৎ তস্কর, রোগ ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদ্বারা যে নিপীড়িত, ভগবত্তত্ত্ব জানিতে যে ইচ্ছুক, ধনকামী যে এবং বিষ্ণুর তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী যে, তাহারাই আমাকে ভজনা করে—বিপদ—দুঃখ ও মায়াগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে—যাহারা যথার্থ জ্ঞানী, পবিত্রকর্ম্মা, মোহনির্ম্মুক্ত এবং ভগবদ্‌তত্ত্ব জানিতে আগ্রহবান্‌, তাঁহারাই ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাহার কৃপা প্রার্থনা করেন—জন্মমৃত্যুরূপ নরকযন্ত্রনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য।

শিষ্য শ্রীগুরুদেবের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—গুরো! এক্ষণে বলুন, ভগবানকে ভজনা করিবার উপদেশ প্রদান না করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব—'ভজ রামকৃষ্ণং'—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে ভজনা কর;—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন কেন? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভজনায় সার্থকতা কি?

শিষ্যের এইরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব তাহার ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা বিদূরিত করিবার জন্য বলিলেন—বৎস! শ্রবণ কর। তুমি যাঁহাকে হয়ত মনুষ্যবুদ্ধিতে আমাদিগেরই মত একজন বলিয়া ভ্রান্ত অনুমান করিতেছ, বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন। উনবিংশ শতাব্দীর ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লবের অবসান-কল্পে তিনি—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য————সম্ভবামি যুগে যুগে।'—এই ভগবদ্বাক্য সার্থককরণে—স্বয়ং

পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার যেরূপ বলিয়াছেন—"এতেচাংশকলাপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"—অর্থাৎ অপরাপর অবতারগণ সেই পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের এক একটি অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে, অর্থাৎ—স্বয়ং পরব্রহ্মই জীবদুঃখে বিগলিত হইয়া পূর্ণাবতারস্বরূপে জগতে আসিয়াছিলেন। * হে শিষ্য! ভগবান শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের আগমন-রহস্য সম্বন্ধে যদি তুমি বিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ কর—দেখিবে,—গীতোক্ত 'ধর্ম্মসংস্থাপ-

---

* পরমেশ্বর নিত্যেশ্বর—ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়াও তে— নরলোকে 'মানুষীং তনুমাশ্রিত্য'—জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তাহারই প্রমাণস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

গীতা। ৪ অঃ ৬

—অর্থাৎ আমি (পরমাত্মা) জন্মহীন, অবিনাশীস্বভাব ও ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও নিজপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া—আত্মমায়ার বশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি [দেহবানিব ভবামি জাতইব]।

নার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—বাক্যের সার্থকতায়—নূতন কোন ধর্ম্মসংস্থাপন তিনি করিয়া যান্ নাই, পরন্তু করিয়াছিলেন তিনি—**"সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।"**

কেবল ধর্ম্মসংস্থাপন—সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিমধ্যে পরিগণিত হয়;—কিন্তু, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব করিয়াছিলেন—'ধর্ম্মসমন্বয়'—বিরাটভাবে,—যাহা কোন যুগে কোন অবতার—মহাপুরুষ, এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও করিয়া গিয়াছেন বলিয় মনে হয় নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন যেন—মীন, কুর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণের মূর্ত্ত সমষ্টিবিগ্রহ! উঁহারা আসিয়াছিলেন শ্রীভগবানের অংশরূপে, অর্থাৎ—ব্যষ্টি হইয়া;—কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন সকলের সমষ্টিরূপে—বিরাট ভাবে; সেজন্য তিনি লোক শিক্ষাকল্পে সাধন করিয়াছিলেন সকল ধর্ম্মই।—কি ইস্‌লামধর্ম্ম, কি খৃষ্টধর্ম্ম, কি গুরু নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, কি তন্ত্র, কি শৈব ও কি বেদান্তের অদ্বৈত সাধন; কোন—সাধনই করিতে তিনি বাকি রাখেন নাই;—সকল ধর্ম্ম সাধন দ্বারা একই সত্যে (একমেবাদ্বিতীয়ম্) উপনীত হইয়া—সর্ব্বোপলব্ধির ফলস্বরূপ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

তিনি প্রচার করিয়া গেলেন—“যত মত তত পথ” * শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এজন্যই তদীয় স্তোত্রে বলিয়াছেন—

“সত্যবোধতয়া সাঙ্গান্ সর্ব্ব ধর্ম্মান্ সমাচরন্।
ধর্ম্মমাত্রন্তু সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতম্ ॥”৪ ॥

—যথা নিয়মে সকল ধর্ম্ম আচরণ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন—সকল ধর্ম্মই সত্য,—কোনটিই মিথ্যা নয়। এজন্য তিনি বলিতেন—'যে যাহার ধর্ম্মে রত থাকিয়া সত্যোপলব্ধি কর,—কাহাকেও অপরের দ্বারে যাইতে হইবে না; কায়মনোবাক্যে যে কোন ধর্ম্ম আচরণ করিলেই—সেই একই সত্যে উপনীত

* “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্!
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥”
—গীতা। ৪ অঃ ১১

“ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব ॥ ৭ ॥
—মহিম্ন স্তবঃ

হইতে পারিবে।' তাঁহার জীবনেও তাই দেখা যায়—

"যে র্যে তৈর্ধার্ম্মিকা যস্মিন্ ধর্ম্মমার্গে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং তন্মতমাদৃত্য ভক্তিস্তত্র দৃঢ়ীকৃতা।
প্রোৎসাহিতা যথান্যায়ং যেন তৎ সাধনেষ্বপি ॥৭॥"

—স্তোত্রম্।

তৎপরে—'সম্প্রদায়বিহীনো যঃ সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি' —কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন না, বা কোন সম্প্রদায়কে তিনি নিন্দা করিতেন না; পরন্তু—"সর্ব্বধর্ম্ম প্রণেতারং"—সকল ধর্ম্মেরই নেতাস্বরূপ হইয়া—যাহাকে যে পথে চালিত করিলে—তাহার ভক্তি বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়া 'শ্রেয়ঃ' লাভ হইবে, তাহাকে সেই পথেই চালিত করিয়া বা চালিত হইতে উৎসাহিত করিতেন! পৃথক্ পৃথক্ বা অংশাংশরূপ ধর্ম্মের সমন্বয়-সাধন করিয়া বাস্তবিকই—সমন্বয়াচার্য্য ও পূর্ণ ভগবানরূপে তিনি—যুগের প্রয়োজন অনুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া আর্য্যক্ষেত্র ভারতভূমিকে চিরপবিত্র করিয়া গিয়াছেন!

শিবাবতার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিতেন— "ওরে! শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং

চৈতন্য অপেক্ষাও বড় বলে জানি।"—ইহা বাস্তবিক, গুরু-ভক্তির আতিশয্যে তিনি বলেন নাই, কারণ—একদেশীভাব তাঁহার চিরপবিত্র হৃদয়ে কখনও ছিল না। তবে—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-রহস্যের বিচার করিলে মস্তক যে আপনা আপনিই নত হইয়া আসে—সেই পূর্ণ-প্রকাশের স্বীকার্য্যে, ইহা অতীব সত্য!

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী বলিয়াছেন—"দেখ! যেই রাম—যেই কৃষ্ণ,—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—কথাটী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দ) বার বার বলিয়াছিলেন ও আমাদের বলিতেন, তাহা যথার্থই! একই শক্তি বারে বারে আসিতেছে,—মাত্র খোল বা শরীরটা ভিন্ন। তবে, যুগানুসারে তাঁহার শক্তিবিকাশেরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং একই শক্তি বার বার আসিলেও—ইদানীং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতার যথার্থই অদ্ভুত!—এমনটী আর কখনও আসেন নাই। পূর্ব্বপূর্ব্ব অবতারগণ—সেই পরব্রহ্মের অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইদানী সমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু—সকলের সমষ্টি রূপে 'পূর্ণ' হইয়াই আসিয়াছিলেন। * * * আমি যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথম যাই,—তিনি আমাকে

জিহ্বায় অঙ্গুলি দিয়া ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং বুকে হাত দিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা করিয়া দিলেন; তারপর—আমি কত কি সব রূপ দেখিতে লাগিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাকে বলিয়াছিলেন—'যখন যা দেখ্‌বি,—এখানে সব বল্‌বি।'—আমিও তাই করিতাম।

"একদিন এক অদ্ভুত দর্শন হইল! দেখিলাম—আমি যেন আমার শরীর হইতে বাহির হইয়া অনন্ত আকাশের উপর বিরাট শূন্যের মধ্য দিয়া একটি স্থানে আসিয়া পড়িলাম। দেখি—সেখানে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় প্রাসাদ! আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম,—তাহাতে আত্মহারা হইয়া গেলাম। দেখিলাম—সেই বিরাট হর্ম্ম্যের অন্তরে—চতুর্দ্দিকে মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বলরাম, বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, মহম্মদ ও চৈতন্য—প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণের অপূর্ব্ব বেদীসকল আলোকে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। সকলেই যে যাঁহার আসনে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থানে দেখিলাম শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবকে;—তিনি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন! তাহারপর দেখি—সকল অবতারই এক এক করিয়া তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া

গেলেন।—তৎক্ষণাৎ আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল,—বড় আনন্দে তাহার পরদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে ঐ অদ্ভুত দর্শনের কথা যথাযথ বলিলাম। সে সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। তিনি দর্শনের কথা শুনিয়া বলিলেন—'ঠিকই দেখেছিস্! —তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়েছিল,—দর্শনের থাক্ পার হ'য়ে এখন হ'তে তুই অখণ্ডের ঘরে গেলি।' * *—এই দর্শন আমার প্রত্যক্ষ;—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবার পূর্ণ হইয়াই আসিয়াছিলেন।"

আচার্য্যদেব শিষ্যকে বলিলেন—'বৎস! স্বামীজী মহারাজ উক্ত দিব্যদর্শনের পরেই—তাঁহার সেই চির-প্রসিদ্ধ "অবতার স্তোত্র" রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে—'সকল হইতে অভিন্ন ও সকলের সমষ্টি বা পূর্ণ'—এই ভাবটী দেখাইয়া গিয়াছেন ও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'পরাবতারত্বে' চিরবিশ্বাসবান হইয়া গাহিয়াছেন—

"যং ব্রহ্মাবিষ্ণুগিরিশশ্চ দেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যং।
তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য **'পরাবতারো'**
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥"

—অর্থাৎ যাঁহাকে আরাধ্যজ্ঞানে স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও নিরন্তর ধ্যান, নমস্কার এবং স্তুতিগানে বন্দিত করেন, তিনিই (সকলের) প্রার্থনা পূরণের জন্য দ্বিভুজধারী শ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে জগতে পূর্ণাবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন।' পরমদ্রষ্টা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীও তাঁহাকে প্রণাম মন্ত্রে বলিয়াছেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
'অবতারবরিষ্ঠায়' রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

হে শিষ্য! ক্রমে সকল বিষয়ই জানিতে এবং বুঝিতে পারিবে;—তবে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং—'শশ্বল্লীলাবিলাসেন' (নিত্য লীলা-রূপে) ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে যেন তোমার সন্দেহ উপস্থিত না হয়। তাঁহার অলৌকিক পুণ্য-চরিত শ্রবণ, মনন ও ধ্যান কর, সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক্ষণে সংসাররূপ অগ্নিকুণ্ড হইতে আত্মবিস্মৃতি-মোহপ্রাপ্ত শিষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য, জ্ঞানাঙ্কুশ আঘাতে তাহার চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন—

দুর্ব্বার-ঘোর-ভবদাববিদহ্যমানো,
জঙ্গম্যসে মলিনবাসনয়াহসুখাপ্ত্যৈ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ,
সন্তাপ-সংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ। অহো (বিস্ময়ে) কথং (কিং কারণং) দুর্ব্বার-ঘোর-ভাবদাব-বিদহ্যমানঃ (দুঃখেন বারয়িতুং শক্যেন ভীষণেন চ জন্মপ্রবাহস্বরূপেণ স্বয়মুত্থিতবন-বহ্নিনা বিশেষেণ দহ্যমানঃ সন্) সুখাপ্ত্যৈ (দাহশমন-রূপসুখমীপ্সুঃ) (যদ্বা) অসুখাপ্ত্যৈ (ভূয়োদুঃখলব্ধয়ে

নিতান্তাল্পসুখপ্রাপ্তয়ে বা) মলিনবাসনয়া (তমোগুণ-প্রধানেন্দ্রিয়-সুখভোগবাসনয়া) নীচাশ্রয়ং (দেহে-ন্দ্রিয়াদ্যনিত্যবস্তূনাং আশ্রয়ং অবিদ্যাধ্যাসবশেন অহং মমেত্যাকারমিথ্যাজ্ঞানং পুনঃপুনরাশ্রয়সে ; অথবা —পাতঞ্জলোক্ত—অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশরূপ ক্লিষ্টবৃত্তিনামাশ্রয়ঃ—নীচাশ্রয়ঃ) ভজসে (অসকৃদ্ আশ্রয়সে ?)—যদি শান্তিকামঃ (বিষয়লালসান্তরি-ন্দ্রিয়ং—বিষয়েভ্যো নিগ্রহীতুকামোঽসি। (তদা) সন্তাপ-সন্ততি-হরং রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্গুণশ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহ প্রত্যয়ৈকতা-নতয়া সমুপাস্স্ব)।

অর্থ। সংসাররূপ প্রচণ্ড-দাবানলপ্রবাহে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া, ক্ষণিক সাংসারিক সুখ,—সুখ কেন ?—অসুখ (দুঃখ) লাভ করিবার ইচ্ছায় বাসনাবদ্ধ হইয়া —এই জন্মমৃত্যুপ্রহেলিকার লীলাভূমি—সংসারে যাওয়া আসা করিতেছ। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়,—স্বয়ং আত্ম-স্বরূপ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়াও কেন তুমি অজ্ঞানরূপ বন্ধনকে বরণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আছ ? যদ্যপি (এই সমস্ত জানিয়া) প্রকৃত শান্তি পাইবার বাসনা কর, তবে—সর্ব্বদুঃখহারী—সংসার-গমনাগমনবিনাশী—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যচরিত শ্রবণ—মনন ও নিদি-ধ্যাসন দ্বারা স্বীয় জীবন গঠন ও শান্তিময় করিয়া তুল।

দীপিকা। (১) দুর্ব্বার ঘোর—অর্থাৎ দুর্ণিবার,—যাহাকে অতিক্রম করিতে অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতে হয়—তাহা। * * মানুষ ইচ্ছা করিলেই এই জাগতিক দুঃখকষ্টের নিবৃত্তিসাধন করিতে পারে না—যতক্ষণ না সে তাহার বাসনার চির উচ্ছেদসাধন করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বজন্মজাত সংস্কাররাশি—এইজন্মে মানবের স্ব স্ব স্বভাবরূপে পরিণত হইয়া—প্রকৃতিবশে তাহাদের কর্ম্ম করায়। (ক) হয়ত বোঝে—এজগৎ তাহাদের ভ্রান্তির ফল ও দুঃখদায়কমাত্র,—কিন্তু তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। উষ্ট্র যেরূপ—'কণ্টক তাহাকে রুধিরাপ্লুত করিয়া যন্ত্রণা দেয়'—জানিয়াও কণ্টকাহারকেই পরম তৃপ্তিকর বলিয়া মনে করে,—সংসারী মানবও সেরূপ প্রতিপদে শোকতাপাদির তীক্ষ্ণাঘাত পাইয়াও সংসারকে রমণীয় জ্ঞানকরে। ইহাতে তাহার স্বভাবই প্রবল ;—স্বভাবই তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় চালিত করিয়া মোহিত করে। সুতরাং, উক্ত স্বভাবকে বশীভূত

(ক) "প্রকৃতে ক্রিয়মানানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

করিতে হইলে যত্ন ও সাধন আবশ্যক এবং বহুজন্ম সাধনার ফলে—তবে যদি এই বাসনা বা সংসারবৃত্তিকে দমনকরা যাইতে পারে! বাসনার এই দুর্দ্দমনীয় বৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—'দুর্ব্বার' ও তৎপরে—'ঘোর'—অর্থাৎ—অতীব ভীষণ। বাস্তবিক মনের বৃত্তি এতই চঞ্চল যে—নিমেষমধ্যে সে চতুর্দ্দশভুবন ঘুরিয়া আসিতে পারে। (১)

মন লইয়াই সংসার,—মনের চালনাতেই ইন্দ্রিয়গণ সাংসারিক ভোগ্যবস্তুচয়কে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই

---

(১) শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী তাঁহার, 'Self-knowledge' নামক পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় মনের গতি সম্বন্ধে বলিতেছেন—"We know that mind is the fastest thing in the world, thought travels faster than electricity or any other current that exists on the physical plane. * * If we can anyway realize the concept of a force which is capable of creating thousand of trillions of vibrations in a second, and if we add to this idea that the velocity of these vibrations is equalled by their rapidity, we see easily enough that thought may put a girdle about the earth in an infinitesimal fraction of time."—অর্থাৎ যদি

ভোগভূমি সংসারমরীচিকার মত জাল পাতিয়া প্রথমে অমৃতের ছায়া দেখাইয়া জীবগণকে মোহিত করে,—কিন্তু পরিশেষে দুঃখজ্বালার অনল জ্বালিয়া সকলকে দগ্ধই করিতে থাকে। সংসারের এই 'বিষকুম্ভঃ পয়োমুখম্'—পিশাচী মায়ার জুয়াচুরির জন্যই বলা হইয়াছে—'ঘোর'। ইহা 'ভবদাব' এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। তৎপরে বলা হইতেছে—

(৩) **ভবদাব-বিদহ্যমানঃ**—অর্থাৎ সংসাররূপ-দাবানল দ্বারা বিদহ্যমান হইয়া— * *। দাবানলার্থে বনাগ্নি। ইহার স্বধর্ম্ম হইতেছে—অরণ্যাণীকে ভস্মিভূত করিয়া জীবজন্তুগণের মৃত্যুর কারণ হওয়া,—সুতরাং ইহা অশান্তিকর ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

আমরা এরূপ কোনও শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, যাহা প্রতি সেকেণ্ডে সহস্র ট্রিলিয়ান্‌বার (১০ লক্ষ = ১ মিলিয়ান্, ১০ লক্ষ মিলিয়ান্ = ১ বিলিয়ান্ [নিখর্ব], ১০ লক্ষ বিলিয়ান্ = ১ ট্রিলিয়ান্ (শত পরার্দ্ধ,—অর্থাৎ ১ র গায়ে ১৮টা শূন্য বসাইলে যাহা হয়, তত বার) স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে এবং ঐ স্পন্দনগুলির দ্রুতত্ব তাহাদের গতির ক্ষিপ্রতার সহিত সমান ভাবে চলে—তবে একটি চিন্তাপ্রবাহ সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেই পৃথিবী বেষ্টন করিতে পারে।

এই যে বিরাট জগৎসংসার,—ইহা আমাদের মনই সৃষ্টি করিয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—"মনোহি জগতং কর্ত্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ,"—অর্থাৎ 'অনন্ত ভূতসমন্বিত চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি একমাত্র চিত্তের স্বভাব, চিত্ত (মন) হইতেই ইহারা কল্পিত হইয়া থাকে।

কামনাই (—যাহা মনেরই বৃত্তি বা কম্পনমাত্র) আমাদের যত অনিষ্টের মূল! কামনার এতটুকু অঙ্কুর থাকিতে—সংসারে জন্মমৃত্যুচক্রে আমাদের পড়িতেই হইবে। 'ভোগ করিব—কর্ম্ম করিব'—ইত্যাদি বাসনা থাকে বলিয়াই—এই ভোগ ও কর্ম্মভূমিরূপ সংসারে আসিয়া আমরা জাগতিক বস্তুনিচয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে ভোগ করিয়া থাকি, কিন্তু—বস্তুতঃ ভোগে সুখ ত পরের কথা,—অসুখের বোঝাই চক্ষের জলে সর্ব্বদা বহন করিয়া থাকি। মহাভারতের কচ ও দেবযানী-সংবাদে অথবা প্রজাপতি মনুর উপদেশে আমরা পাই—

"ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

— মনু ২।৯৪

—অর্থাৎ বাসনা কখনও ভোগের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না ;—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে—নির্ব্বাপিত না হইয়া তাহা যেরূপ বাড়িতেই থাকে,—ভোগে বাসনাও সেরূপ নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ আমরা দেখি,—মানুষ সংসারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতির আশ্রয়ে অহরহঃ ব্যতিব্যস্ত হইতেছে ;—মোহের আবরণে সকল বস্তুকেই 'আমার' করিয়া লওয়ায়—প্রতিনিয়তই তাহার অভাব ও বিনাশে শোক প্রাপ্ত হইতেছে। তৎপরে সংসার সুখের স্থান ভ্রমে তাহার লালসায় ছুটিতেছে, কিন্তু পদে পদে অসুখ ও অশান্তিকেই তাহারা বরণ করিতেছে। মহাত্মা কবির দাস এই ব্রহ্মাণ্ডের ভীষণাবর্ত্তন ও পরিণতি দর্শন করিয়া সেজন্য বলিয়াছেন—

"চল্‌তি চক্কি দেখ কর্ দিয়া কবীরা রোয়।
দো পাটন্‌কে বিচ্‌মে সাবুত গিয়ান্ কোয়॥"

—অর্থাৎ এই যে সংসাররূপ যাঁতা ঘুরিতেছে,—ইহা দেখিয়া পাগল কবির দাস কাঁদিয়া বলিলেন—'আহা! একটি জীবও এই পেষণযন্ত্রের দুই পাটের মধ্যে পড়িয়া অক্ষত গেল না।"—সুতরাং এই যে

জগতের দুঃখজ্বালাময় প্রবাহ, ইহার ইঙ্গিতেই— "**ভবদাব**" বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে বলা হইতেছে যে—এই 'ভবদাবানলে'—

(খ) বিদহ্যমানঃ।—বারবার বিদগ্ধ হইয়া—। বাসনা যতদিন থাকে, ততদিন আসা যাওয়া ও দুঃখবরণ থাকেই। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নির দাহিকা-শক্তির পুনপুনঃ আস্বাদন (তাপ) পাইয়াও—তাহাতে ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, আমরাও সেরূপ সংসারের কুটিল হাস্যরহস্য অবগত হইয়া পদে পদে তাহার জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি এবং বাসনাও অতৃপ্ত থাকিয়া যাইতেছে। এতদ্সম্বন্ধে আরও বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পুনরায় বলিতেছেন—

(৪) সুখাপ্ত্যৈ (বা অসুখাপ্ত্যৈ)।—[মলিন-বাসনয়া+অসুখাপ্ত্যৈ সুখাপ্ত্যৈ বা—মলিনবাসনয়াঽ-সুখাপ্ত্যৈ]—অর্থাৎ এই ভবদাবে দগ্ধ হইবার সুখ-লিপ্সায় কিম্বা অত্যল্পসুখ বা দুঃখ পাইবার কামনায় ইত্যাদি।

এ' জগতে মানুষ সুখের জন্য পাগল ? অবশ্য জাতিগত সুখ—শাশ্বতসুখ বা আনন্দসিন্ধুর বিন্দু হইলেও —স্বার্থআবিলতায় আবৃত হওয়ায়—মাত্র ইন্দ্রিয়সুখেই

ইহার অর্থ পর্য্যবসিত হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়সুখ—'আমিত্বে'র রঙে রঞ্জিত;—'আমি ভাল থাকিব' 'আমি ভাল খাইব'—'আমি সুখী হইব, আমার পরিবারবর্গই মাত্র সুখভোগ করিবে'—ইত্যাদি যে ভাব,—তাহা স্বার্থদুষ্ট। ইহাতে দ্বৈতবুদ্ধি বা ভ্রমকেই মানুষ বরণ করিয়া থাকে।

দ্বৈতবুদ্ধিতে—আপনাকে অপর হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু—শাস্ত্রচক্ষে ইহা শৃঙ্খলস্বরূপ। শাস্ত্র বলেন—'তোমার মধ্যে যে অনন্ত সত্তা রহিয়াছেন, তাহাই অদৃষ্টভাবে বিশ্বের ও চরাচরের মধ্যে অবস্থিত—'একমেবাদ্বিতীয়ম্';—অর্থাৎ ভূতে ভূতে এক—অদ্বিতীয় নারায়ণই মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন।' সর্ব্বদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই গাহিয়া গিয়াছেন—

—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

অতএব কাহাকেও আপনা হইতে ভিন্নজ্ঞান করিয়া সুখলাভে অগ্রসর হইলে তাহা ইন্দ্রিয়চরিতার্থরূপ

স্বার্থসুখে পর্য্যবসিত হয় এবং এরূপ সুখ বা দুঃখ বন্ধনেরই নামান্তর। উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

—মায়াবদ্ধ মানুষ কিন্তু ঐ অল্প সুখ বা স্বার্থের কুম্ভিচক্রেই প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে এবং শাশ্বতসুখে বঞ্চিত হইয়া অনিত্য জাগতিক সুখকেই সর্ব্বস্বজ্ঞান করিয়া তৎপ্রাপ্তির আশায় অমূল্য মনুষ্য-জীবন উৎসর্গ করিতেছে;—কিন্তু তাহারা জানে না যে—সুখকে বরণ করিতে যাইলেই—তদ্বিপরীত দুঃখকে তুলিয়া লইতে হইবে, কারণ—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।'—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ,—ইহারা চক্রের মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—'সুখের মুকুট পরিয়া দুঃখ আসে আবার দুঃখের মুকুট পরিয়া সুখ আসে, একটিকে রাখিয়া অপরটি ভোগ করিব, ইহা হইতে পারে না।'

দ্বিতীয়তঃ সুখ—যাহা ইন্দ্রিয়সুখ, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহাতে শান্তিহীন জ্বালাই অধিক। আজ একজন বিভবশালী মানব,—অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্য তিনি সুখী'—কাল হয়ত পথের ভিখারী হইয়া চক্ষের

জলে তিনি বক্ষ ভাসাইতেছেন ;—একজন স্ত্রী পুত্র-কন্যাদি লইয়া আজ সুখের সংসার পাতিয়াছেন—কাল হয়ত কালের করালকবলে তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া শোকের সাগরে ভাসিতেছেন। সুতরাং সুখ বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহা দুঃখেরই নামান্তর, সেজন্য শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ 'সুখাপ্তে' বা সুখাশার পরিবর্ত্তে 'অসুখাপ্ত্যে' বাক্যরূপ অঙ্কুশাঘাতে আমাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতেছেন মাত্র!

মৃগ বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া সুখ পাইবার আশায় দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া যায়,—কিন্তু সুখের চরমানুভব হয় তাহার জীবন সমাপ্তিতে! মোহ—লোভহত আমরাও সেরূপ ছুটিয়া চলি অনিত্য সাংসারিক সুখের জ্বলন্ত দীপশিখায়,—আর পদে পদে বরণও করিয়া থাকি সেজন্য অসহ্য জ্বালাময়ী যন্ত্রণা। শান্তিশতকে বেশ একটি উপমা আছে, যথা—

"অজানন দহাত্তিং বিশতি শালভোদীপদহনং।
ন মীনোঽপি জ্ঞাতা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতং॥"

—অর্থাৎ পতঙ্গ জানে না পুড়িয়া মরার কি যন্ত্রণা,—সেজন্য সে দীপাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া

জীবনাহুতি প্রদানকরে;—মৎস্যও জানে না যে—যে মাংসখণ্ড সে আহার করিতে যাইতেছে, তাহার মধ্যে মৃত্যু রহিয়াছে,—সেজন্য সে বড়িশযুক্ত মাংসখণ্ড গিলিয়া ফেলে। আমরাও ঠিক ঐরূপ ভাবাপন্ন;—সুখান্বেষণে আনন্দলাভ করিতে যাইয়া দুঃখকেই প্রতিনিয়ত বরণ করিতেছি। মহাকবি ভারবি তাই কিরাতার্জ্জুনীয়ে বলিয়াছেন—

"শ্বস্ত্বয়া সুখসংবিত্তিঃ স্মরণীয়াধুনাতনী।
ইতি স্বপ্নোপমান্ মত্বা কামান্মাগাস্তদঙ্গতাং॥"

১১।১৪।

—আজ যে সুখ অনুভব করিতেছ,—কাল আর তাহার অনুভব থাকে না;—এতদ্দর্শনে বাসনার বিষয়ে আনন্দকে স্বপ্নসদৃশ জানিয়া—কখনও তাহাদের বশীভূত হইবে না।

—কিন্তু তাহা শুনে কে? সুখের পরিচ্ছদে অসুখলাভ কামনায় আমরা—

(৬) **মলিনবাসনয়া।**—ইন্দ্রিয়ের ভোগ ও জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখদায়ক কামনায়, অথবা তমোগুণপ্রধান ইন্দ্রিয়সুখভোগবাসনায়—ইত্যাদি। * * পণ্ডিতগণ দুই

প্রকার বাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—শুদ্ধা ও মলিনা। (১) 'শুদ্ধা'—জন্মমৃত্যু-বিনাশিনী এবং (২) 'মলিনা'—জন্ম ও সর্ব্বদুঃখের কারণ। —অর্থাৎ যাহা অজ্ঞানের পরিপুষ্টি ও পুনর্জ্জন্মের বিধান করিয়া থাকে, তাহাই 'মলিনা' এবং যাহা পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত না হইয়া ভৃষ্টবীজের ন্যায় প্রারব্ধবশতঃ মানবের শরীরধারণের কারণ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, তাহাই 'শুদ্ধা' বাসনা।

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী বলিয়াছেন—"কাম বা কামনা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন,—সুতরাং তাহা অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব ও মুক্তিপথের বিষম অন্তরায়। এই কামনা বা প্রবৃত্তিই মানুষকে সংসারের দাস করে এবং ইহার বশেই মানুষ সু-কু-কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া সদসৎ ফলভোগের জন্য সংসার-প্রহেলিকায় পতিত হয়।

"প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইতেছে 'স্বভাব' হইতে এবং স্বভাব—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যথা—হয়ত কেহ আম্রভক্ষণ করিল ও আম্র খাওয়ার জন্য তাহার ক্ষণিক আনন্দ সঞ্জাত হইল, কিন্তু খাইবার বাসনা আর তাহার বিনষ্ট হইল না, একটি

সংস্কার রহিয়া গেল। —ঐরূপ বর্ত্তমান জন্মে যাহা ভোগকরা যায়,—পরজন্মে ছাপের (চিত্রের বা spotএর) ন্যায় তাহার সংস্কারটি রহিয়া যায়, এবং যতবারই ভোগ করা যাইবে—ততবারই সংস্কারের এক একটি ছাপ পড়িতে পড়িতে তাহার স্তর প্রস্তুত হইবে।

সকল সংস্কারই পুনরায় ভবিষ্যতে কামনা অর্থাৎ বাসনায় পরিণত হয়। বাসনা হইতে সংকল্প আসে;—সুতরাং সংকল্প যাহার আছে, সংকল্পের আনুসঙ্গিক ঐ সংস্কার বা বাসনাদিও তাহার অনুগমন করে; কাজেই—সংকল্পহীন না হইলে নিবৃত্তি বা শান্তিলাভ অসম্ভব, সেজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।"

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—গীতা। ২য় অঃ ৬২।৬৩।

অর্থাৎ—

বিষয় ভাবনা জাগায় প্রেরণা
তাহাতে কামনা জনমে প্রবাহে,
প্রবাহ রোধিলে গরজি হিল্লোলে
ক্রোধ উঠে জ্বলে জাগাইয়া মোহে।
মোহ-মোহিনী পদতলে দলে—
স্মৃতি-শক্তিধারা হাসি অনুপলে,
বুদ্ধি বিবেক জড়তা শৃঙ্খলে
বন্দিনী হ'য়ে নাশে প্রাণ দোহে
রজোগুণোদ্ভূত কামনা পিশাচী
চঞ্চল সত শান্তিধারা মুছি,
স্বভাব জননী সংস্কার দানি,
কামনা যাহার জয়গান গাহে।
বিচার-কৃপাণে কাটি কাম-মেষ
শান্তিছায়াতলে করহ প্রবেশ,
সংসার-শৃঙ্খলে ভাঙ কুতূহলে,
ছুটি চল বীর সর্ব্বজয়ী হোয়ে॥

—বাস্তবিক, বিষয় হইতেই আসক্তির উৎপত্তি ;—ক্রমে তাহাতে কামনা এবং কামনা কোন উপায়ে প্রতিহত হইলেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধের উদয়ে

সদসদ্বিচারবুদ্ধির লোপ পায় ও যাবতীয় স্মৃতি সমূলে বিনষ্ট হয়; তৎপরে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশে মানুষ জীবন্মৃত—জড়েরতুল্য জীবন যাপন করে।—এই যে বাসনা—যাহাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া বিস্মৃতির-পথে ক্রমাগতই জীবনমৃত্যুচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে,—ইহাই 'মলিনা' বাসনা—সংসারমরিচীকায় প্রলুব্ধকারিণী!

মলিনার বিপরীতই—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'শুদ্ধা' বা সদ্‌বাসনা—যাহা বিবেকের পুণ্যালোক চির প্রস্ফুটিত করিয়া মানবকে 'শান্তিমার্গে প্রধাবিত করে, এবং জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকাময় যবনিকা অপসারণের জাগ্রত-প্রেরণা প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে ক্রমশই উন্নতির স্রোতে প্রবাহিত করিয়া থাকে! এই 'সং' বাসনাই মুক্তির কারণ এবং ইহারই বরণে জন্মমৃত্যু-যন্ত্রনাদায়িণী কামনার উচ্ছেদ সাধন ঘটে! এক্ষণে অসৎ কামনার বিষময় পরিণতির নিন্দাসূচনার্থেই "মলিনবাসনয়া" শব্দ শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"সংকল্প সংক্ষয়বশাদ্ গলিতে তু চিত্তে।
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি॥"

—যোগাবশিষ্ঠ। উৎ প্রঃ—১৩

—অর্থাৎ বাসনাক্ষয় হইলে চিত্তের বিকার নষ্ট হয় ও তৎক্ষণাৎ সংসারের মোহ-নীহার বিলীন হইয়া যায়। তখন শরৎকালের আকাশের ন্যায় হৃদয়ে স্বচ্ছ—চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম দৃষ্ট হন। —কিন্তু মন্দবুদ্ধি মানুষ তাহা না করিয়া—বাসনাকেই বর্দ্ধিতাকারে লাভ করিবার জন্য—

(৭) নীচাশ্রয়ং।—অবিদ্যাধ্যাস বশে 'আমার—আমার'—এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি অনিত্যবস্তুসকলের পুনঃ পুনঃ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; অথবা বলা যায়—অবিবেকবশে পাতঞ্জলোক্ত অবিদ্যাস্মিতা-রাগদ্বেষ-অভিনিবেশরূপ ক্লিষ্টবৃত্তিসকল আশ্রয় করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ—বলা হইয়াছে—অবিদ্যাধ্যাসবশে—ইত্যাদি। এক্ষণে অবিদ্যা ও অধ্যাস কাহাকে বলে? অবিদ্যার্থে * দর্শনকার 'ন বিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান বা 'মায়া' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। মায়ার

---

* পাতঞ্জলের মতে—"স্ব স্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ। তস্য হেতুরবিদ্যা।" ২৩।২৪।—অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর সংযোগই উভয়ের স্বরূপ ও শক্তি উপলব্ধির হেতু এবং সেই সংযোগের হেতুই অবিদ্যা নামে খ্যাত।

অপর নামই ভ্রম। এই ভ্রমেই অধ্যাস বা অধ্যারোপ কার্য্যের সার্থকতা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রের ভাষ্যাবতারনায় 'অধ্যাস' নির্ণয়ার্থে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" —অর্থাৎ অধ্যাস হইতেছে—স্মৃতিরূপ (বর্ত্তমান সময়ে স্মৃতির বিষয়ীভূত বস্তুর সদৃশ) অন্য বস্তুতে (অযোগ্য অধিকরণে) পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর অবভাস বা প্রকাশ। তৎপরে—নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ ও সাংখ্য—মতাবলম্বিগণের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-দেখাইয়া বলিতেছেন "তথা চ লোকেঽনুভবঃ—শুক্তিকাহি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।"—অর্থাৎ লোকমধ্যেও সেরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে যে—শুক্তি (ঝিনুক) রজতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে,—একই চন্দ্র দুইটির ন্যায় প্রতিভাসমান হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ভ্রমহেতু মিথ্যাজ্ঞানই যথা—রজ্জুতে সর্পদর্শনই অধ্যাস নামে অভিহিত। এই মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংসারের যাবতীয় অনিত্য বস্তুকেই আমরা নিত্য জ্ঞান করিয়া—'আমার' করিয়া লইতে চেষ্টা করি। সামান্য কাচখণ্ড যেরূপ অজ্ঞ বালকের নিকট বহুমূল্য মুক্তা বলিয়া প্রতীত ও সমাদৃত হইলেও বয়স্কের

নিকট তাহা হেয় ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, এই সাংসারিক ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুনিচয়ও সেরূপ ভ্রমান্ধ মানবের নিকট মূল্যবান ও আদরণীয় হইলেও—জ্ঞানীর নিকট হেয় ও নীচাশ্রয় বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। আমরা শাস্ত্র পড়িয়া ও সাধুগণমুখে ইহার অসারত্ব শুনিয়াও ইহাতে আসক্ত হইতেছি—দেখিয়া জ্ঞানবান আচার্য্যদেব তৎসমূহে হেয়জ্ঞান আনয়নের জন্য বলিতেছেন—"নিচাশ্রয়ং"।

দ্বিতীয়তঃ—মহর্ষি পতঞ্জলি—'অবিদ্যাস্মিতাদি'কে নীচাশ্রয় বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন,—কারণ তাহারাও "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং—",—অবিদ্যারূপ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অবিদ্যার জন্যই মানবের অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মবোধ হইয়া থাকে। * এবং এই বোধের আশ্রয় অতীব হেয়—যেহেতু অনিত্য,—সেজন্য শ্লোকে বলা হইয়াছে "নীচাশ্রয়ং।"

---

* (১) "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যা।" পাতঞ্জল। সা, পা, ৫

(২) "তদ্দুষ্টজ্ঞানম্।" [বৈশেষিকদর্শন ৯অঃ ২আঃ ১১]
—অর্থাৎ ভ্রম বা দুষ্টজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলে।

তৃতীয়তঃ—তাপত্রয় সুখভোগের প্রতিবন্ধক ভাবিয়া—তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ নানাপ্রকার ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকে, ভাবে—ঔষধাদিই তাহাকে সাংসারিক যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি দিয়া যথার্থ নিরাময়তা বা শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু—মাত্র নশ্বর শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাই সুখলাভের একমাত্র যন্ত্র, যন্ত্রের বিকলত্বই দুঃখের কারণ,—এইরূপ জ্ঞানকরা মূঢ়তা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দৈব অথবা প্রাকৃতিক ঔষধাদি শরীরকে নিরাময় করিতে পারে সত্য,—কিন্তু সে নিরাময়ত্ব সম্পাদনে শাশ্বত শান্তিকে লাভকরা যায় না। শরীর পাঞ্চভৌতিক ও নশ্বর, জাগতিক বস্তুসমূহও পরিবর্ত্তনশীল,—সুতরাং ইহারা অনিত্য এবং এই অনিত্য বস্তু দিয়া অনিত্যভোগের বাসনাশয়—'নীচাশ্রয়' ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব এরূপ নীচাশ্রয়ে ভোগলিপ্সার অসৎ বাসনা লইয়া কেন তুমি—

(৮) **জঙ্গম্যসে**—পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতেছ? এখানে পূজ্যপাদ স্তোত্রকর্ত্তার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—মানুষ স্ব-স্বরূপ বা আপনাকে না জানিয়াই অনিত্য সংসার-খেলায় মত্ত হইয়া রহিয়াছে।

বালকবালিকাগণ যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ধূলাখেলা করিয়া থাকে এবং প্রতিদিন একই খেলার দ্রব্যসমূহ ভাঙে ও গড়ে—আশা আর মিটে না, মনুষ্যগণও সেরূপ এই সংসাররূপ অনিত্য খেলাঘরে ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক বস্তুনিচয় ও ভোগবাসনা লইয়া খেলা করিতেছে,—খেলা শেষ হইলে পুনরায় সকল ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে ;—আবার আসিবে খেলার অতৃপ্তবাসনা লইয়া, খেলিবে অনিত্য খেলা, আবার ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে। এইরূপ যাতায়াতে বা উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা ভ্রমণে মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখজ্বালারূপ নিষ্পেষণযন্ত্রে পড়িয়া পিষ্ট হইতেছে, তথাপি বিবেক জাগিতেছে না—মোহের ও ভোগের নেশা ছুটিতেছে না। এই জন্যই কৃপাপরবশ হইয়া আচার্য্যদেব অন্তরে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'—এই অভীমন্ত্রের অগ্নিবীণা ধ্বনিত করিয়া মানবের এই ভ্রমপূর্ণ গমনাগমনের নিন্দাসূচকার্থে "জঙ্গম্যসে" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

আত্মেতর বস্তুসকলই কালগ্রাসী ও নশ্বর, অতএব নশ্বর দ্রব্যে আসক্তি বাতুলতারই চিহ্ন। এই নশ্বর—আত্মেতর বস্তুসকলের পরিণতি শাস্ত্রমুখে ও আচার্য্যমুখে শ্রবণ করিয়াও বিবেকবুদ্ধিযুক্ত জীব—আমরা পুনরায়

তাহাতেই মত্ত হইতেছি। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব আশ্চর্য্যে সেজন্য—"অহো" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং—

(৯) **যদি**।—অর্থাৎ মোহবশে যদিও বহির্ম্মুখী বৃত্তিদ্বারা অনিত্য-বাহ্য-বিষয়ে আসক্ত হইয়া আছ, তথাপি এখনও যদ্যপি—

(১০) **শান্তিকামঃ**।—বিষয়লালসা হইতে মনকে নিগ্রহ করিয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে ইচ্ছা কর ইত্যাদি।

মন আমাদের স্বভাববশে প্রতিনিয়তই বাহ্যবিষয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। 'ইহা ভোগ করিব—উহা ভোগ করিব'—এইরূপ করিয়া প্রমত্তের ন্যায় ভোগে ক্ষণিকানন্দ এবং ভোগাশার প্রতিহতে দুঃখলাভ করিতেছে। সাবানের মধ্যে একীকৃত ফেনপুঞ্জ যেরূপ ঘর্ষণের দ্বারা বর্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হয়,—মনোবৃত্তিসমূহের অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ। এজন্যই শাস্ত্রকারগণ 'ন ভোগে উপশাম্যতি' ইত্যাদি বলিয়া শমদমাদি সাধন দ্বারা বহির্ব্বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে আদেশ দিয়াছেন। যোগদর্শনকার পতঞ্জলিও এই মনের ভীষণাবস্থা দর্শন করিয়া যোগমার্গের উপদেশ করিয়াছেন যথা—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।'—চিত্তবৃত্তি-নিরোধদ্বারাই 'যোগ' সাধিত হয় এবং এইরূপ

বহির্ব্বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ে বৃত্তিনিরোধদ্বারাই যথার্থ শান্তি বা আত্মা দৃষ্ট হন।

এক্ষণে শান্তি কি প্রকার এবং কাহারা শান্তির অধিকারী—তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"

—গীতা। ২অঃ।৭১

—কামসকলকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যে পুরুষ কোনরূপে প্রাণধারণের অনুকূল ব্যাপারমাত্র সম্পাদন করিয়া পর্য্যটন করেন, সেই নিস্পৃহ—নিরহঙ্কার পুরুষ শান্তি (মোক্ষ) লাভ করেন। "ন শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী,—'কামাসক্ত ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।' তৎপরে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"

—গীতা। ৪।৩৯

—অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়ে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া আস্তিক্যবুদ্ধিতে সাহায্যকারী গুরুর পরিচর্য্যাদি

ইন্দ্রিয়-সংযমদ্বারা জ্ঞানলাভ করিলে আত্যন্তিক সংসার-নিবৃত্তিদ্বারা শান্তি বা মোক্ষ অধিগত হয়। এবং

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।"

—গীতা। ৯।৩১।

—অর্থাৎ জাগতিক ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি সত্ত্বেও যদ্যপি মানব একান্ত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয় ও সর্ব্বদা প্রার্থনা করে—তাহার মনোবৃত্তির গতি পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য, তবে কৃতকর্ম্মের অনুতাপ জন্য সত্বরই সে পবিত্রাত্মা হইয়া শান্তিলাভে ধন্য হয়। কারণ—শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—'ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং—ইত্যাদি'—অর্থাৎ সর্ব্বভূতের হৃদয়েই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যন্ত্রারূঢ় সকল জীবকেই মায়াদ্বারা ভ্রান্ত করিয়া চালিত করিতেছেন। এতটুকু কার্য্যও বিরাটশক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত যখন সঙ্ঘটিত হইতে পারে না, তখন মানুষের কর্ত্তব্য—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

—গীতা। ১৮।৬২

—অর্থাৎ সর্ব্বভাবের সহিত তাঁহার (ঈশ্বরের) শরণ গ্রহণ করা এবং তাঁহার অনুগ্রহেই পরমশান্তি ও শাশ্বতপদকে প্রাপ্ত হওয়া তাহা হইলে সম্ভব হইবে।

চিত্তবিক্ষেপই দুঃখের মূলকারণ। এ'জন্য 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে' অথবা 'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ'—ইত্যাদি উপদেশবাক্য কথিত হইয়াছে—তাহাকে নিরোধ করিবার জন্য, কারণ নিরোধ বা ত্যাগেই যথার্থ শান্তি—'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' [গীতা। ১২।১২] কিন্তু চিত্ত-নিরোধই যে একমাত্র শান্তিভূমি—এই জ্ঞানই বা আমরা পাইব কোথা হইতে? আচার্য্যদেব বলিতেছেন—মহাপুরুষগণের নির্ম্মল-শান্ত চরিত্র হইতে। পবিত্রাত্মা মহামানবগণ যে জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া যান, তাহার অনুসরণ অর্থাৎ স্মরণ—মনন ও ধ্যানদ্বারাই আমাদের চিত্তবৈকল্য বিনষ্ট হয়; কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

গীতা। ৯।৩৪

—'মন্মনা—মদ্ভক্তঃ' এখানে আত্মা বা পবিত্রাত্মার আদর্শচরিত্রকে লক্ষ্য করিতেছে। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সেজন্য বলিতেছেন—'**সন্তাপ-সংস্মৃতিহরং**'—ত্রিতাপ ও জন্মমৃত্যুবিনাশী অর্থাৎ যাঁহার আদর্শে মনোনিবেশ করিলে তাপ ও সংসার-গমনাগমন নিবারিত হইয়া আত্মানুভূতি লাভে মানব ধন্য হয়,—সেই অলৌকিক লীলাজন্য দেহধারী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—'পরাবতারঃ', তাঁহার সাধনায়—তাঁহার কথিত উপদেশবাণী ও আদর্শানুসরণে জীবন চালিত করিলে-অনুসরণকারী যে চির পবিত্র হইবেন এবং সংসার-ভ্রমণ-ক্লান্তির চির অবসানসাধনে শান্তির অধিকারী হইবেন,—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের শাস্ত্রজ্ঞানাহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য পুনঃরায় স্বস্নেহবচনে বলিতেছেন—

শাস্ত্রেষ্বনাত্মসু কথং হি তব প্রবৃত্তিঃ,
দুস্তর্কজালমিহ দেশিকবাগিরুদ্ধং।
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজমন্দবুদ্ধে,
সন্দেহ-বিভ্রমহরং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ। কথং (কোন প্রকারেণ) অনাত্মসু (যেম্বাত্মোপদেশোনাস্তি তাদৃশেষু) শাস্ত্রেষু (প্রবৃত্তিনাস্তিকসন্দর্ভেষু) তব (তে) প্রবৃত্তিঃ (শুশ্রূষা) হি (নিশ্চয়েনাসন্দেহেনেতিযাবৎ) (ভবতি)? ইহ (এষু ত্বদীয়াসন্দেহপ্রবৃত্ত্যাকর্ষকেষ্বনাত্মসু নাস্তিকশাস্ত্রেষু) দেশিকবাগিরুদ্ধং (গুরূপদেশবিরোধি) সিদ্ধান্তহীনম্ (স্বপক্ষস্থাপনাহীনং) অপি (চ) দুস্তর্কজালং

(তর্কাভাসসমূহঃ) (বর্ত্ততে)। (হে—) মন্দবুদ্ধে (রজস্তমঃসংকৃতমতে) (তৎকুতর্কজালং) সন্ত্যজ (সম্যকতয়া—অশেষেণ জহাহি)। (সন্ত্যজ্য চ) সন্দেহ-বিভ্রমহরং (স্থাণুর্বায়ং পুরুষোবেতি দ্বিকোটিকং জ্ঞানং সন্দেহঃ, রজ্জ্বাদৌসর্পাদিবুদ্ধিভ্রমঃ। তদুভয়না-শকম্) রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্‌গুণশ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহ-প্রত্যয়ৈকতানতয়া সমু-পাস্স্ব)।

অর্থ।—অনাত্মশাস্ত্র (—যাহাতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে জড়পদার্থবিষয়ক জ্ঞান উদিত হয়,—সেই সকল নাস্তিক শাস্ত্র) পাঠে তুমি আসক্তিযুক্ত কেন? যাহা গুরুবাক্যের অনুকূল নয়,—যাহা সুমিমাংসায় উপনীত না করাইয়া স্বপক্ষস্থাপনে অসমর্থ,—সেই কূটতর্কজাল পরিত্যাগ করিয়া—সকল সন্দেহ ও ভ্রান্তিবিনাশন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভজনা কর।

দীপিকা। (১) মন্দবুদ্ধে। হে মূঢ়বুদ্ধি নর-নারি! 'মূঢ়বুদ্ধি' বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ,—আমরা শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও,—আমাদের বিবেক-বিচারের আলোকচক্ষু থাকিতেও ইচ্ছা করিয়া মলিনতা

ও অন্ধত্ব আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। লুকোচুরি খেলায় চোর যেরূপ স্বেচ্ছায় চক্ষুবন্ধন বরণ করিয়া সঙ্গীগণের নিকট হইতে বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে, আমরাও দর্শনমুখে আমাদের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া সেরূপ স্বেচ্ছায় অজ্ঞানকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধির আলোককে আবৃত করিয়া সংসারিক দুঃখের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লইতেছি। ভ্রমকে ইচ্ছাকৃত বরণ দ্বারা আমরা পাগলামীর পথে অগ্রসর হওয়ায় শ্লোকে বলা হইয়াছে আমাদের—'মন্দবুদ্ধি'; শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পড়িয়া একটা অহঙ্কার ও আত্মাভিমানে আমরা ভাবি—বুঝি ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রপাঠ দ্বারাই আয়ত্ত করিয়া ফেলা যায়; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল! মাত্র শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্যে ঈশ্বরলাভ হয় না।*—তাহার পর আত্মশাস্ত্র,—যাহা পড়িলে ঈশ্বরানুসন্ধানে মানবের প্রবৃত্তি জন্মে,—তাহার পাঠে বরং প্রেরণা বা ইচ্ছা জাগিতে পারে, কিন্তু—অধিকাংশ লোকই জগতে আসক্ত অনাত্মশাস্ত্রে অর্থাৎ—

---

* "ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন—" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

(২) অনাত্মস্থ ।—আত্মতত্ত্বোপদেশহীন,—অর্থাৎ যাহা আত্মান্বেষণের প্রেরণা জাগ্রত না করিয়া মাত্র জড়ের উপাসনায় নরনারীকে নিবদ্ধ করে, তাহাকে অনাত্মশাস্ত্র বলে।

শাস্ত্রসকলকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা (১) আত্মশাস্ত্র (২) অনাত্মশাস্ত্র। (১) আত্মশাস্ত্র কাহাকে বলে ? —যাহাতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ নিহিত আছে,—যাহা পাঠ করিয়া যথার্থ বিচার বুদ্ধির উদয়ে 'সৎ' যাহা—'বস্তু' যাহা, যথার্থ 'নিত্য ও আনন্দময়' যাহা,—তাহার জ্ঞান হয়, তাহাই 'আত্মশাস্ত্র' নামে অভিহিত। আত্মশাস্ত্র বলেন—'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট বিদ্যামানতার পশ্চাতে এমন এক অদ্বিতীয় মহান্‌শক্তি আছেন, যাঁহার জ্ঞানে জগতে কোন কিছুই অধিগত হইতে বাকি থাকে না। শ্রুতিও বলেন—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। * * যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং, [ছান্দোগ্য ৬।১।৩-৪] * * 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসাদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। [ছান্দোগ্য-৬।২।১] অর্থাৎ —অদ্বিতীয় এক 'সৎ' ব্রহ্মই সত্য। এক মৃৎপিণ্ড-

কে জানিলে যেরূপ সব মৃন্ময়জাত পদার্থকেই জানা যায়, সেরূপ অদ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞানে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়—অনালোচিত বিষয় আলোচিত হইতে পারে এবং অজ্ঞাত বিষয় অবগত হওয়া যায়;—অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট সর্ব্ববস্তুর জ্ঞানই প্রতিভাত হয়,—যেহেতু 'জ্ঞান' এক ব্যতীত দুই নহে। তৎপরে—

(২) **অনাত্মশাস্ত্র।**—ন আত্মশাস্ত্র,—অর্থাৎ যাহাতে আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান করাইয়া জড়ের দিকে মনকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই অনাত্মশাস্ত্র নামে খ্যাত। ইহাতে একত্বের সন্ধান না দিয়া বহুত্ব বা ব্যষ্টি-সত্তারই সঙ্কেত প্রদান করে। মানুষের অস্তিত্ব তাহার শরীর লইয়া;—শরীরের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের যাবতীয় উপকরণ যথা—টাকাকড়ি—সাংসারিকবস্তুনিচয় এবং মন—যাহা শরীরের চালক ও কর্ত্তা,—তৎপ্রসাদার্থে—মান—যশ ইত্যাদি সকলই নিত্য ও প্রাপ্তব্য,—ইহাই শিক্ষা দেয় 'অনাত্মশাস্ত্র'। চার্ব্বাকের মত ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চার্ব্বাক বলেন—দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নাই,—এই শরীরই আত্মা, ইহার ধ্বংসে আর সংসারাগমন ঘটে না; অতএব ইহার সুখস্বচ্ছন্দতা-বিধানই পরম শ্রেয়স্কর—ইত্যাদি। পাশ্চাত্যজাতিও

ইহার উদাহরণস্থল বলা যায়,—কারণ তাঁহারা জড়ের উপাসনায়—ভোগের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং শান্তি বলিতে তাহারা দেহান্তাবস্থাই বুঝেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র যথা—দর্শন—উপনিষদ ও পুরাণাদি ধর্ম্মপুস্তক তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন—এই বিরাট জড়ের অন্তঃস্থলে এক চৈতন্যসত্তা আছেন, যাঁহার শক্তি বা প্রকাশে সকল বস্তু প্রকাশিত হইতেছে। ঐ চৈতন্যসত্তা—অনুসন্ধিৎসু ঋষিগণ কঠোর যত্ন ও সাধনবলে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা "একমেবাদ্বিতীয়ং" মন্ত্র ভারতের আকাশে বাতাসে স্বাধীন প্রাণে ছড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ধন—মান—ভোগসামগ্রী ও শরীরাদিকে তুচ্ছ করিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত আনন্দ বা আত্মাকেই তাঁহারা 'সত্য' জ্ঞান করিতেন। যথা—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। * * * ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন, শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।" [বৃহদারণ্যক উঃ ২।৪।৫]—অর্থাৎ—পুত্রগণের প্রীতি নিমিত্তে পুত্রসকল পিতার প্রিয় পরিগণিত হয় না, পরন্তু পিতার আত্মার প্রীতি সম্পাদন হেতু পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়। এইরূপ ধনরত্নাদি সর্ববস্তুই প্রিয় বোধ হয় যেহেতু—প্রত্যেকেরই আত্মসত্ত্বা আছে বলিয়া। আত্মার অস্তিত্ব লইয়াই আকর্ষণ—ভালবাসা—মমতা ও দয়ার মর্য্যাদা! সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একমাত্র 'আত্মার' উদ্দেশ্যেই সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য, —কারণ আত্মাকে দর্শন, মনন বা অনুভব করিলেই জগতের সর্ব্ববস্তু বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এইজন্যই আত্মদ্রষ্টা ঋষিগণ গাহিতেন "স্বপ্নপম ধনজনগৃহম্, দারাদিকবান্ধবং, ত্যজরে ত্যজ, ভজরে ভজ কৃষ্ণং ব্রজবল্লবম্॥ কুসুমোপমমিহ সীদতি, ভব সুন্দরযৌবনম্, গর্ব্বং জহি খর্ব্বং কুরু, সর্ব্বং হি ভব-বন্ধনং॥"—ধন-জন-যৌবন ও অহঙ্কার সকলই পুষ্পের তুল্য মলিন হইয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে না,—যাহা

থাকিবার—তাহাই থাকিবে—সেই নিত্য অবিনশ্বর "আত্মা" ;—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

—গীতা। ২।২০।

সেই আত্মা কোন সময়ে জন্মায়ও নাই—মরেও নাই, দেহাদি নশ্বর পদার্থের ন্যায় ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই,—ইহা জন্মহীন—অবিক্রিয় ও নিত্যসিদ্ধ,—শরীরের ধ্বংসে ইহার নাশ হয় না। অতএব হে আত্মবিস্মৃত মানব! তুমি—

যে দেহরে আপন বল, ভাব তাহা আপন কিনা।
পঞ্চভূতের সৃষ্টি-কায়া, পঞ্চভূতে তার্ সীমানা॥
আপন্ যদি চিত্তে ধর, যায় না কেন মৃত্যু পর ?
বিবেক সনে বিচার্ কর, তবেই সত্য যাবে জানা॥
রাজ্যৈশ্বর্য্য মান্ যশ্, এ'জগতের কুটিল হাস্,
পরায় কেবল্ বাঁধন্ ফাঁস্, মৃগে যথা ব্যাধের বীণা॥
জড় যে তোমার্ অন্তঃচেতন্, দেখ্ না মন্ খুলি নয়ন্,
সেই চেতনের আরাধনায়, যাবে তোমার আনাগোনা।

শরীর, ধন ও স্ত্রীপুত্রাদির পূজায় যে—যথার্থ সুখলাভ হয় না, তাহা বারংবারই শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, জ্ঞানেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ" [তৈত্তিরীয় উঃ ৪।১২]—এই যে উপদেশ, ইহা আত্মশাস্ত্রান্তর্গত; কিন্তু ইহার বিপরীত শিক্ষা যে শাস্ত্র প্রদান করে, তাহাই 'অনাত্মশাস্ত্র'। তৎপরে বলা হইয়াছে—

(৩) **শাস্ত্রেষু।** শাসন-পুস্তকে। —শাস্+ষ্ট্রন =শাস্ত্র; অর্থাৎ যাহা কি বৈষয়িক—কি আধ্যাত্মিক পথে চলিবার সময় আমাদের সাবধানবাণীদ্বারা শাসন করেন,—তাহাই শাস্ত্র। কি জড় জগত—কি আধ্যাত্মিক জগত উভয়ের নিমিত্ত বহুশাসনগ্রন্থ আমাদের বিদ্যমান আছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা ও রঘুনন্দনাদি লিখিত সকলই সামাজিক শাসন-গ্রন্থ,—ইহারা স্মৃতি বা সংহিতা নামে কথিত। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক ও ভক্তিগ্রন্থ। ষড়দর্শন,—যাহা দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ান্ত গ্রন্থ,—তন্মধ্যে (১) মহামুনি কপিল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিতে মুক্তি (কৈবল্যাবস্থা) স্বীকার

করেন যথা—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ।" [সাংখ্য সূঃ ১] তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা 'ঈশ্বর' স্বীকার করেন না; পরন্তু তাঁহার মতে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"
—সাংখ্যকারিকা।২১

—'পঙ্গ্বন্ধবৎ'—অর্থাৎ পঙ্গু যেমন চলিতে পারে না ও অন্ধ দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্ধ ও পঙ্গুর সম্মিলনে যেরূপ দর্শন ও গমন উভয়কার্য্যই সংসাধিত হয়, সেরূপ চেতন পুরুষ অচেতন প্রধানে আরূঢ় হইয়া মহত্তত্ত্বাদি ও সৃষ্টিস্থিত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সাংখ্যের পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমো-গুণসম্পন্না হইলেও জড়া,—সেজন্য ক্রিয়াশক্তির নিমিত্ত চৈতন্যের একান্ত মুখাপেক্ষী। * * * কৈবল্যাবস্থায় প্রতিপুরুষই (যেহেতু সাংখ্যে পুরুষকে বহু স্বীকার করা হইয়াছে—"পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ" ৬।৪৫) স্ব-স্বরূপ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতির অতীত হইয়া শুদ্ধস্বভাব পুরুষের কেবলীভাব হওয়াই সাংখ্যের চরম লক্ষ্য। (২) তৎপরে

মহর্ষি পতঞ্জলি* ;—তাঁহার গ্রন্থকে পাতঞ্জল-দর্শন বলে। তিনি সেশ্বর সাংখ্যবাদী ;—কারণ 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্‌বা' সূত্রে তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ। ২৪।" —অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং আশয় যাঁহাকে অধীন করিতে পারে না, সেই পুরুষই ঈশ্বর, এবং পুরুষার্থ বা মুক্তি হইতেছে—বুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধিতে। কৈবল্যার্থে তিনি বলিতেছেন—

—"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।"

—পাঃ বিভূতিপাদঃ।৫৬

—অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিত্যশুদ্ধ আত্মার কল্পিত ভোগ তিরোহিত হয়। সত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের শুদ্ধি বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা হয় এবং আত্মার কল্পিত ভোগ-নিবৃত্তিকে আত্মশুদ্ধি কহে। এই বুদ্ধিশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধিদ্বারাই আত্মার কৈবল্য বা মোক্ষলাভ হয়।

---

* এই পতঞ্জলি ঋষি পাতঞ্জল-যোগসূত্র ব্যতীতও পাণিনির ব্যাকরণের মহাভাষ্য ও সুশ্রুত নামক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রচনা করেন।
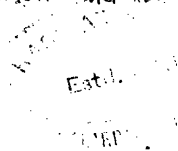
(৩) নৈয়ায়িক গৌতমের মতে—'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ॥১॥"—অর্থাৎ উক্ত ষোড়শবিধ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি হয়। তবে এই নিঃশ্রেয়সলাভে মোক্ষলাভ হয় না। মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত (ক) দুঃখ (খ) দুঃখোৎপত্তির কারণ (গ) দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ও (ঘ) আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তির উপায়—এই চারিপ্রকার পদার্থের সম্যক জ্ঞানদ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান সঞ্জাত হয়।—কিন্তু এই তত্ত্ব-জ্ঞানেও মোক্ষ বা অপবর্গলাভ তৎক্ষণাৎ হয় না, পরন্তু তিনি বলিতেছেন—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" —ন্যায়দর্শন সূঃ ২।

—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানান্তে শনৈঃ শনৈঃ ক্রমশঃ জীব অপবর্গলাভ করে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হয়, মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংসে রাগদ্বেষাদি দোষ নিবৃত্তি পায়,—রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুৎপত্তি ও ভোগাদির দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয় হয়,—সুতরাং পুনর্জ্জন্মের বিনাশে দেহধারণ করিতে

না হওয়ায় দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিদ্বারা অপবর্গ বা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। *

(৪) বৈশেষিককার কাণাদের মতে—অণু হইতে দ্ব্যণুকে—এসরণু ও চতুরণুকাদিক্রমে 'ঈশ্বরচিকীর্ষবশাৎ' এজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। অণু নিত্য ও অব্যয় পদার্থ। তৎপরে মোক্ষ সম্বন্ধে কাণাদ বলিতেছেন—

"আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ।"

—বৈশেষিকদর্শন। ৬অঃ ২য়াঃ ১৬।

—অর্থাৎ—'ইচ্ছাদ্বেষপূর্ব্বিকা ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তিঃ [১৪]'—অর্থাৎ ইচ্ছা ও বিদ্বেষ হেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এবং "তৎ সংযোগোবিভাগঃ।" [১৪]—উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে সংযোগ ও বিভাগ অর্থাৎ জন্মমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শ্রবণ—মনন ও নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা আত্মকর্ম্ম হইলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে,—কারণ ঐ সকল সাধন দ্বারা

* "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।" [ন্যায়দর্শন ১।২২]
—অর্থাৎ জন্মনামক যে দুঃখ, যখন তাহার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়, তখনই তাহাকে মোক্ষ বলা যায়।

সমাধিমার্গে অগ্রসর হইলে দেহাদির প্রতি অহং জ্ঞান বিনষ্ট হয় ও তজ্জন্য সুখাদির প্রতি ইচ্ছা ও দুঃখাদির প্রতি দ্বেষ আর থাকে না,—তখন চরম দুঃখনিবৃত্তিতে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

(৫) পুনঃ পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনির মতে মুক্তি কিন্তু ক্রিয়াপর। বৈশেষিকার কাণাদ ধর্ম্মার্থে যেরূপ—'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।' —অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভের কারণীভূত যাহা—তাহাই ধর্ম্ম বলিয়াছেন,মহর্ষি জৈমিনি সেরূপ —'চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ।২।' —অর্থাৎ বিধিগম্য অর্থই ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত এবং তদ্বিপরীত— অধর্ম্ম। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে,—মুক্তি বা সুখকে তিনি ক্রিয়াপর স্বীকার করেন। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' ;—অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তিতেই তাঁহার মতে—পরমপুরুষার্থ। কিন্তু (৬) উত্তরমীমাংসাকার ব্যাস মুক্তির ক্রিয়াপরত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে এক এবং অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তিপদবাচ্য।

উক্ত অদ্বৈতমতের পৃষ্ঠপোষক ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করের মতও ঐরূপ। * তিনি বলেন—এই জগৎ মায়িক,—কাল্পনিক বা অধ্যাস মাত্র ; ইহা অজ্ঞানেরই নামান্তর। অজ্ঞানের অবসানে এক ও অনন্ত আত্মসত্তা —ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন এবং তাঁহার অনুভূতি বা তদাকার প্রাপ্তিতেই মুক্তি ঘটে। তৎপরে—উপনিষদ্, —যাহা বেদের জ্ঞানকাণ্ড, তাহাতেও ঐ এক— অদ্বিতীয় সত্তার উল্লেখ আছে এবং তাঁহার জ্ঞানেই যথার্থ মুক্তিলাভ হয়।

এক্ষণে, ঐ অদ্বিতীয় বস্তুটি কি ?—না 'ব্রহ্ম',— 'বৃংহনত্বাৎ ব্রহ্মেতি' অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই থাকিতে পারে না। উপনিষদ্ তল্লক্ষণ নির্দ্দেশে বলিতেছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" [তৈত্তিরীয় উঃ ৩।১।১]

---

* উক্ত উত্তর মীমাংসা বা ব্যাসসূত্রের উপর বহু ভাষ্যকার বিভিন্ন মত পরিপোষণে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, যেমন— আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে, আচার্য্য শ্রীমধ্ব দ্বৈত মতে আচার্য্যবল্লভ ভেদাভেদবাদে, আচার্য্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতমতে ইত্যাদি।

—অর্থাৎ ভূতগণ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়—যাহাতে জীবিত বা অবস্থিত থাকে এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জান।* উত্তর মীমাংসাকার বেদান্তসূত্রে সেজন্য বলিয়াছেন—"**জন্মাদ্যস্য যতঃ।**" [১।১।২]—অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম জানিবে। অতএব এই ব্রহ্মই আমাদের প্রাপ্তব্য।

পঞ্চদশীকার বলিতেছেন—

"সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগদ্ভেদো যথা যথা।
উৎপ্রেক্ষ্যতেঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা"
—২।৯৪

—অর্থাৎ সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদীরা বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দ্বারা জগতের যে যে প্রকার সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন—তাহা করুন, তাহাদিগকে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই; কারণ ব্যবহারিক বিষয়ে সকলের মতেই ঐক্য দৃষ্ট হয়, কেবল পারমার্থিক-সত্তা বিষয়ে বিচার করিতে আমরা

* ইহা হইতেছে—ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি ২।১।১] স্বরূপ লক্ষণ।

যত্নবান হই। পারমার্থিক সত্তাই হইতেছেন ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বশাস্ত্রেরই একরূপ প্রতিপাদ্য। ব্রহ্মেতর বস্তু আমাদের প্রাপ্তব্য নয়,—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। যথা—

"যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈবভবত্যেষ ইতি শ্রুতিঃ।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরৎ॥"

—পঞ্চদশী ।৭।২৪।

—অর্থাৎ—'ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হন'—এই শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া—তৎপ্রতি একাগ্র হইয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে এবং ব্রহ্মেতর বিষয় পরিত্যাগ করিবে।'

ষড়্দর্শনের পর আমরা পাই তন্ত্র-শাস্ত্র। ইহাও ক্রিয়াবিশিষ্ট। ইহাতে যে সকল করণ আছে, তাহার অনুষ্ঠানে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায়। পঞ্চ 'ম'কার সাধন,—যাহা প্রবৃত্তিশীল মানবগণকে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে উন্নীত করিবার একটি প্রক্রিয়া মাত্র, তাহা এই তন্ত্র-শাস্ত্রের অন্তর্গত। তন্ত্রে আদ্যাশক্তিকেই জগৎকারণ—সনাতনী বলা হইয়াছে। সর্ব্ব রমণীর মধ্যে আদ্যাশক্তির প্রকাশ বা প্রতিচ্ছবি

দর্শনই ইহার মুখ্য সাধন। বেদান্তে যেরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ আছে, ইহাতেও সেরূপ শিব ও শক্তির উল্লেখ আছে। শিব (মহেশ্বর) শব তুল্য নিষ্ক্রিয়;—ইঁহারই ইচ্ছাশক্তিরূপিণী কার্য্যকরী শক্তি—ত্রিগুণান্বিতা মহাকালী। —এ' জন্য শক্তি বা কালী শিবের পত্নী কল্পিত। যথার্থ তান্ত্রিক বা 'কৌল' এ নিমিত্ত 'শিবের বুকে শ্যামার নৃত্য' বা সৃষ্টি দর্শনে শক্তিকে ছাড়িয়া শিব বা পরমপুরুষে মন সংলগ্ন দ্বারা সর্ব্ব বাসনা ত্যাগে শান্তি লাভ করেন। তখন জীব হয় কালীর প্রলয় নৃত্যাদির সাক্ষীস্বরূপ চিরসমাধিগত শব বা শিব, এবং ইহাই তন্ত্রের মোক্ষ বা মুক্তি। *

এক্ষণে মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে—দর্শন ও শ্রুতিসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র ও পুরাণাদি

---

* তন্ত্র প্রথমে ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেও, পরিশেষে এক—অদ্বিতীয় পরমপদ শান্তি বা জ্ঞানেই ইহার উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত করিয়া থাকে। এ জন্য ইহাকে আনুষ্ঠানিক-বেদান্তও বলা যাইতে পারে, কারণ বেদান্তের অদ্বৈত ভাবটিকেই ইহাতে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে।

'আত্মশাস্ত্রেরই' অন্তর্গত। জ্যোতিষ, বীজগণিতাদি আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ করে না,—ইহারা কেবল শাস্ত্র জড় লইয়াই ব্যস্ত। বৌদ্ধ-শাস্ত্রসকলও আত্মশাস্ত্রের অন্তর্গত,—তবে ইহার একাংশ (সৌগতাদি) শূন্যত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

তৎপরে চার্ব্বাকের ধর্ম্মমত;—ইহা সম্পূর্ণই অনাত্মশাস্ত্র—নাস্তিকমত পোষণকারী। ইহা শরীরকে আত্মা স্বীকারে জড়ত্বের পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছে মাত্র। * * বহু শাস্ত্র—বহু মত; বস্তুতঃ আস্তিক বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা না থাকিলে শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে অঙ্কিত না,—সত্যের অনুসন্ধানেও প্রবৃত্তি জাগে না। তাহার পর দেখা যায়, সাধারণতঃ জড়ের উপাসক বিষয়ীমানবগণ জড়বাদপরিপুষ্টিকারক অনাত্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিতে ও তর্কজালে অপরকে পরাস্ত করিয়া আত্মাভিমান বরণ করিতেই সর্ব্বদা উন্মুখ। এরূপ অনাত্মশাস্ত্রমার্গী নরনারী যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে,—শ্রেয়ঃপথ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া নাস্তিকতা বা সুবিধাবাদকে বরণ করে এবং সেজন্য উত্তমাগতি লাভ করিতে না পারিয়া সাংসারিক দুঃখযন্ত্রণাঘাতেই জর্জ্জরিত হইতে থাকে। গীতায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্র অর্থাৎ আত্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥"

—গীতা ১৬।২৩

—অর্থাৎ 'যিনি শাস্ত্রবিধি (—শাস্ত্রবিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যম্) পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিয়া থাকেন,—তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় না এবং তিনি সুখ ও পরমাগতিকে লাভ করিতে পারেন না।'—কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সংসারে যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে, তখন কোন্‌টি সৎ—কোন্‌টি অসৎ বা কর্ম্মাকর্ম্ম বুঝিবার জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন। সেজন্য পুনঃরায় তিনি বলিয়াছেন—

'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥"

—গীতা ১৬।২৪

—এই শাস্ত্রকে (আত্মশাস্ত্রকে) পরিত্যাগ করিয়া যিনি উচ্ছৃঙ্খলতার পথে গমন করিয়া থাকেন—

আচার্য্যদেব তাঁহার সেই ভ্রান্তবুদ্ধি দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন—

(৪) কথং হি তব।—কেন তোমার ? —অর্থাৎ অনাত্মশাস্ত্রে যথার্থোদ্দেশ্য সাধিত হয় না,—তাহারা নাস্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং শরীরাতিরিক্ত আত্মার স্বীকার না করিয়া জড় শরীরকেই তাহারা উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। জড়ের জ্ঞানে মুক্তি হয় না, আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানেই মানুষের মুক্তি লাভ হয়; অতএব আত্মশাস্ত্রই সকলের অবলম্বনীয়,—অনাত্মশাস্ত্রে বৃথা সময়ের অপচয় করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য অনাত্মশাস্ত্রাভিমানীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'কথং হি তব'—

(৫) প্রবৃত্তিঃ ?—শুশ্রূষা বা আসক্তি (উৎপন্ন হইল ?)! প্র+বৃত্তি ;—বৃত্তি শব্দে স্বভাব, যাহা বৈজ্ঞানিক আখ্যায় 'কম্পন' অভিহিত হইতে পারে। অথবা যথা—জল ও তাহার তরঙ্গ, তরঙ্গ কম্পনমাত্র —জলের বিকার,—মন এবং বৃত্তিও সেরূপ। মনের কম্পন বা চাঞ্চল্যই বৃত্তি। এই 'প্রবৃত্তি' মনেরই ভিন্ন মূর্ত্তি,—সেজন্য ইহাকে কামনাও বলা হইয়া থাকে।

কামনা সদসৎভেদে দুই প্রকার। সৎকামনা আত্মোন্নতির সোপানস্বরূপ ও অসৎকামনা তদ্বিপরীত—আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা ধ্বংসকারী। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়ে, চারিফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিজায়া,—(তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে-লবি,
(ওরে) বিবেক নামে তার ব্যাটা যে, তত্ত্বকথা তায় শুনাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্যঘরে কবে শুবি,
(যখন্) দুই সতীনে পীরিত হবে, তখন্ শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর্, পিতামাতা তাড়াইবি,
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ, (তবে) জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান—সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি,
(তবে) বাপু বাছা বাপের্ ঠাকুর, মনের্ মতন্ মন হবি॥

প্রবৃত্তি হইতেই মোহের উৎপত্তি হয় এবং মোহই সংসারবন্ধনের কারণ। মোহকে নাশ করিতে হইলে

—প্রবৃত্তির প্রবাহ রুদ্ধ করিতে হইবে। প্রবৃত্তির ক্ষয় হইলেই মন স্থির হইয়া অন্তর্ম্মুখী হয় এবং তদ্দ্বারাই জ্ঞানোপলব্ধি সম্ভবপর হয়, অন্যথা জন্মমৃত্যুরূপ সময়-ক্ষেপণদ্বারাই অসংখ্য জীবন কাটিয়া যায়। শ্লোকে—'প্রবৃত্তি'—'অনাত্মশাস্ত্রেষু' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহা অসৎরূপেই পরিগণিত। এবম্প্রকার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয়দান শাস্ত্রকর্ত্তার উদ্দেশ্য নহে। এজন্য তিনি বলিতেছেন—'ইহ'—অর্থাৎ এই সকল নাস্তিক-মতপোষণকারী অনাত্মশাস্ত্রে আমরা পাই কি ? —যা যুক্তি, তর্ক ও উপদেশ সম্পূর্ণ—

(৬) **দেশিকবাগ্বিরুদ্ধং।** —গুরুবাক্যের প্রতি-কূল। * * শাস্ত্র বলেন—গুরুবাক্য বেদবাক্য। বেদ অপৌরুষেয়, কোন লোকদ্বারা ইহা সৃষ্ট নয়, একমাত্র আদিপুরুষই ইহার বক্তা (?) * সে নিমিত্ত বেদবাক্য

---

* এতদ্সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বলেন—যাহা চির সত্যরূপে বিরাজমান—সনাতন, সেই সত্য সমষ্টিই বেদ, ইহার রচয়িতা কেহই নন। আদিপুরুষ ইহার বক্তা হইলে বেদের অনাদিত্ব প্রমান অসম্ভব। জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়—এ সত্যটী যেরূপ অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান, 'একোহহং বহুস্যাম্' ইত্যাদি সত্যও সেরূপ নিত্য। মনু, ব্যাস

কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা যেরূপ বর্ণে বর্ণে সত্য ও বিশ্বাস্থ, গুরু—যিনি 'ত্বং হি বিষ্ণুবিরিঞ্চিস্ত্বং, ত্বঞ্চ দেবো মহেশ্বরঃ'—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীকস্বরূপ ও শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার নিরসনে জ্ঞানের আলোক প্রদর্শনকারী যিনি,—তাঁহার বাক্যও সেরূপ বিশ্বাস্য এবং পালনীয়। —কিন্তু মানবের মনে একাকারাবৃত্তি বাস করা অসম্ভব, সেজন্য তাহারা দেবতা ও পরক্ষণে সয়তানের পূজা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে। দেবতা হইতেছে 'বিশ্বাস'—যাহা শ্রদ্ধা বা আস্তিক্যবুদ্ধিরই নামান্তর। মৃত্যুপতি যমের নিকট বরগ্রাহী নচিকেতার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সর্ব্বলোভসংবরণে আত্মতত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বাস একটি বড় জিনিস;—ইহা সৃষ্টিকারী, মানবজীবনের উন্নতিবিধায়ী। শাস্ত্র যাহা বলেন ও শাস্ত্রদ্রষ্টা জ্ঞানবান শ্রীগুরুদেব যাহা বলেন—তাহা সত্য, —এইরূপ আস্থাবান হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিতমার্গে

যজ্ঞবিধান ও উপাসনাপ্রণালী বেদ নহে, বেদ বলিতে যথার্থ জ্ঞান বা ব্রহ্মকে বুঝায়।

প্রধাবনের নামই 'বিশ্বাস'। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ ইহাকে উচ্চাসন প্রদানে বলিয়াছেন—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"—বিচারের দিক দিয়া তর্কের মর্য্যাদা যদিও অধিষ্ঠিত,—তথাপি তাহা আস্তিক্য হওয়া চাই, অন্যথা সত্যে বিশ্বাসই মূল্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বিশ্বাসের বিপরীতই সংশয় বা সন্দেহ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। -অর্থাৎ সংশয়যুক্ত লোক বিনষ্ট হয়। "গুরুদেব এই কথা বলিয়াছেন,—ইহা কি সত্য ?"—বিশ্বাস হারাইয়া উদ্দেশ বিচারের বশবর্ত্তী হওয়ার নামই 'সংশয়'। যথার্থ বিশ্বাসে বিচার নাই, বিচার যেখানে—সন্দেহও সেখানে। সন্দেহের অনুগামী হইয়া আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ না করিলে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। ইহা সত্য যে—দ্রষ্টা দৃশ্যসম্বন্ধে যাহা বলিবেন—তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না; গুরু বা আচার্য্য যিনি (১) তিনি সত্যোপলব্ধি স্বয়ং করিয়াছেন; অন্ধকার নাশের উপায় সম্যক বিদিত ও স্বয়ং আলোকমণ্ডিত

---

(১) এখানে গুরু বা আচার্য্য বলিতে একমাত্র আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানীপুরুষকেই বুঝাইতেছে।

হইয়া তবে শিষ্যের অন্ধকার দূর করেন,—এজন্য তাঁহাতে 'গুরু' নামের সার্থকতা আছে। ভূগোল যিনি পড়িয়াছেন ও ভূপর্য্যটন দ্বারা স্বয়ং যিনি পৃথিবীস্থ সকল স্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এতদুভয়ের মধ্যে দ্রষ্টার মর্য্যাদাই সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। * * শাস্ত্র কতকগুলি সত্যের বোঝা বহন করিতেছে মাত্র এবং অনুভবহীন পণ্ডিতকুলও সেই বোঝায় উদর ভর্ত্তি করিতেছেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহারা উভয়েই অন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'ময়রার তাড়ু; তাড়ু নিজে রসগোল্লার রসে ডোবে বটে,—কিন্তু চৈতন্যশক্তি না থাকায় রসের আস্বাদ সে কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না।' অতএব শাস্ত্ররহস্যবিজ্ঞাতা আচার্য্যদেব যাহা বলিবেন—তাহা অবশ্যই সত্য এবং তাহার প্রতিকূলাচরণে বরং সন্দেহান্ধকারেই চির নিমজ্জিত হইতে হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্যদেবই ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিতে একমাত্র সক্ষম; সে জন্য শ্রুতি বলিতেছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"—অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের জ্ঞান-

উদ্দেশ্যে শিষ্য (জিজ্ঞাসু) সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবেন এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার দ্বারা তাহার ধারণা ও উপলব্ধি করিবেন। কারণ—

আঁধারে আঁধার কাটে কি কখন ?
আলোকের চির সেথা প্রয়োজন,
যে জানে পন্থা সে পথ দেখালে
অনায়াসে যাবে তরে।
ঐ মেরুশিরে তুহীণের রাশি,
স্বর্ণ-তপণ গলাইল হাসি,
ছুটে তবে নদী পাগলিনী হয়ে
চুমিতে বিশাল-নীরে॥

শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ "দেশিকবাগ্বিরুদ্ধং"—যাবতীয় মার্গ বা বাক্য সে জন্য (জিজ্ঞাসু শিষ্যের মঙ্গল বিধানের জন্য) ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, —কারণ পরবর্ত্তী বাক্যেই তিনি বলিয়াছেন—'যাহা গুরুবাক্যের প্রতিকূল, তাহা—

(৭) **সিদ্ধান্তহীনং**।—অমীমাংসিত বা স্বপক্ষ-স্থাপনহীন যে মত বা মার্গ সত্যকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়া

যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপনে বাধা উৎপাদন করিয়া থাকে অথবা যে বস্তু আছে, তাহার সন্ধান প্রদান করিতে কত বক্র উপায়ে—জটীল বাক্য বিন্যাসে—গুরুগম্ভীরে যাহা অগ্রসর হইয়া ফলদান করে হয়ত বিন্দুমাত্র, তাহাই 'সিদ্ধান্তহীন'। সিদ্ধান্তহীন বস্তুমাত্রই মিথ্যাড়ম্বরের প্রতীক অথবা ভিত্তিহীন—কেবল বাক্যপরিপাট্যেরই ঝন্‌ঝনা মাত্র। এইরূপ সিদ্ধান্তহীন—

(৮) **দুস্তর্কজালং**।—তর্কাভাসসমূহ। এখানে 'দুস্তর্কজালং' অর্থে অনেকে বোধ হয় 'দুঃ' অর্থাৎ দুঃসাধ্য তর্কসমূহ বা কূটতর্কাদি ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা সমীচিন নহে;—কারণ কূটতর্ক ন্যায়ের নিয়মান্তর্ভূক্ত,—তাহাতে সিদ্ধান্ত সুদূর লক্ষিত থাকে বটে,—কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা মীমাংসার সমাধান ও স্বপক্ষ স্থাপনে সম্ভবপর হয়। শ্লোকে 'দুস্তর্কজালের' বিশেষণরূপে 'সিদ্ধান্তহীনং' ব্যবহৃত হওয়ায়—'তাহা কোনরূপ স্বপক্ষস্থাপনে সক্ষম হয় না—ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং দুস্তর্কজালকে এখানে কুতর্কজাল বলিলেই তাহার যথার্থ অর্থ অনুধাবন করা হয়।

এক্ষনে 'তর্ক' বলিতে আমরা বুঝি কি? তর্ক শব্দের অর্থ হইতেছে—আলোচনা বা বিচার, অর্থাৎ

কোন একটি অমীমাংসিত বস্তুকে মীমাংসার বিষয়ী-ভূত করণে যে বাদানুবাদ বা বিচারের প্রয়োজন হয়, তাহাকেই তর্ক কহে। মহর্ষি গৌতম ইহাকে ষোড়শ পদার্থের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তর্কার্থে তিনি বলিতেছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।"
—ন্যায়দর্শন। ১।১।৪০

—অর্থাৎ কোন বিষয়ের তত্ত্ব জানা না থাকিলে তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য জ্ঞাতার ইচ্ছা হয়। তদনন্তর সেই বিষয় বা বস্তুর উপর—'ইহা অমুক—কি অমুক' এইরূপ দুই পক্ষের উত্থাপন করিয়া যে পক্ষে কারণের সহায়তা পাওয়া যায়,—সেই পক্ষই অনুমোদিত হয়। এই প্রকার স্থির হইলেই জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ হয় এবং ইহাকেই তর্ক বলে।

এই তর্ককে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) তর্ক (২) দুস্তর্ক ও (৩) কুতর্ক। তন্মধ্যে স্বপক্ষীয়মতাবলম্বিগণের প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীনে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তালোচনার নাম 'তর্ক'। দ্বিতীয়—কূটবিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হিসাবে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া

অতি কষ্টে সিদ্ধান্তে উপস্থিতির নাম 'দুস্তর্ক'—যাহার ধারা পাই আমরা নব্য-ন্যায় প্রভৃতিতে। তৃতীয়—কোনরূপ যুক্তিপ্রমাণের মর্য্যাদা না রক্ষা করিয়া অপরমত খণ্ডনকরণের যে ধারা—তাহাই 'কুতর্ক' নামে অভিহিত। শেষোক্ত তর্কে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না এবং আস্তিক্যবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে না। এই ধারানুযায়ী আমরা দেখি, অনেক লোক আছেন—যাঁহারা আনন্দ পান কেবল তর্ক করিতেই; কোন সামান্য একটু বিষয় পাইলেই উপমা ও প্রমাণের বোঝায় তাহাকে পর্ব্বতসদৃশ করিয়া ফেলেন। বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রাদি অহরহঃ প্রমাণ করিতেছেন যে—এই বিরাটসৃষ্টির অন্তঃস্থলে এমন একটি শক্তি আছেন, যাহা অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তুই নাই এবং তাহাই ব্রহ্ম (—ঈশ্বর, শক্তি বা গুরু);—কিন্তু কুতর্কবাদিগণ তাঁহাদের অনুভূতিযুক্ত সেই কল্যাণকর বাণী জানিয়া শুনিয়াও কেবল ঐ তর্ক—'ঈশ্বর অস্তি অথবা নাস্তি? এই অস্তিনাস্তির চাপে পণ্ডিতগণ প্রায়ই হতবুদ্ধি হইয়া যান্;—কিন্তু যথার্থ জিজ্ঞাসুমাত্রেরই বোঝা উচিত যে—সকলের মূলে এক অনুভূতি। উপলব্ধি ব্যতীত

বাদানুবাদ উপহাসাস্পদ মাত্র! আচার্য্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন—

"বাগ্‌বৈখরী-শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্‌!
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥"

—অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি, শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল এবং পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য—ভোগের জন্য, উহা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।

ভক্তিসূত্রে দেবর্ষি নারদ বাদানুবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—"বাদো নাবলম্ব্যঃ।" —অর্থাৎ কখনও তর্ক করিবে না। কূটতার্কিক সম্বন্ধে 'চৈতন্য-চরিতামৃতকার' শ্রীরামানন্দ রায় বলিতেছেন—

"অরসজ্ঞ কাকচুষে জ্ঞাননিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥"

—জ্ঞানার্থে এখানে সিদ্ধান্তহীন শুষ্কবিচার 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর,'—যতই কুতর্ক করা যাইবে—ততই বাক্যাড়ম্বর ও শাস্ত্র-প্রমাণের বোঝায় যথার্থ সত্য কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। সেজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নৈষা তর্কেণমতিরাপেনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায়প্রেষ্ঠ।"

—তর্ক দ্বারা সদ্বুদ্ধিরূপ মতি লাভ করা যায় না। * * ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই আত্মা যথার্থরূপে জ্ঞানগম্য হন। কেবল শাস্ত্রবাক্যের পঠনদ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

—কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৫।৯।৩

—(এই) আত্মাকে কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা (গ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি) দ্বারাও নহে এবং বহুশ্রুত দ্বারা (গুরুমুখে বা প্রভূত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ দ্বারা) ও নহে; পরমাত্মাকে বরণ দ্বারাই তাহা সাধিত হয়, অথবা পরমাত্মাকে পাইবার তীব্রবাসনা থাকিলে, তিনি আপন স্বরূপ সাধকের নিকট প্রকাশ করেন।

'ঈশ্বর আছেন—কি নাই'—এই বিষয়ে বাদানুবাদে কোনই ফল হইবে না। এত বড় সৃষ্টিচাতুর্য্যের মধ্যে থাকিয়া—ইহা স্বতঃই মনে জাগরিত হয় যে—ইহা

কখনও আপনা হইতে সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয় না, নিশ্চয়ই ইহার মূল উৎস একটি আছে—যাহা হইতে সৃষ্টি জাত, যাহাতে স্থিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি যেরূপ সম্ভবে না (ক)—বাস্তব জগৎও সেরূপ কখনও শূন্য বা মিথ্যা হইতে উদ্ভূত হয় না, ইহার 'কারণ' নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। এই কারণই হইতেছেন 'ঈশ্বর'। ইঁহাকে উপলব্ধি ব্যতীত বুঝিবার উপায় নাই; শাস্ত্র সেজন্য বলিতেছেন —"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে?"—(অর্থাৎ 'আছেন তিনি'—ইহা বলা ব্যতীত তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে কিরূপে?)। অতএব আস্তিক্যবুদ্ধির প্রয়োজন, নাস্তিক্যবুদ্ধিতে সত্যোপলব্ধি হয় না: এজন্য শ্লোকে বলা হইয়াছে **'সন্ত্যজ'**—অর্থাৎ সম্যকরূপে ত্যাগ কর এবং—

(৯) **সন্দেহবিভ্রমহরং**।—সন্দেহ ও ভ্রম-বিনাশী ইত্যাদি। * * এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে 'সন্দেহ'ই বা কি, আর 'ভ্রমই' বা কি? প্রথমতঃ—

(ক) "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

—গীতা—২।১৬

"নাসতো সদুৎপত্তিঃ।" —সাংখ্যদর্শন।

'সন্দেহ' যথা—'স্থাণুর্বায়ং পুরুষোবেতি দ্বিকোটিকং জ্ঞানং'—অর্থাৎ অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটি বস্তু দৃষ্ট হওয়ায় মনে দ্বৈতানুমান উপস্থিত হইল—'ইহা কোন কাষ্ঠগুঁড়ি অথবা লোক?' লোক কি গাছ—ইহা স্পষ্ট নির্দ্ধারিত না হওয়ায় সংশয় উপস্থিত হইল এবং ইহাকেই 'সন্দেহ' বলা হয়। ক দ্বিতীয়তঃ 'ভ্রম' হইতেছে "রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবুদ্ধিঃ"—অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত 'সন্দেহে' স্থির বুদ্ধি সঞ্জাত হয় না—দোলায়িত থাকে, কিন্তু শেষোক্ত 'ভ্রমে' ধারণা স্থির হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রম বা আত্মায় শরীর-জ্ঞান স্পষ্টই হইয়া থাকে, কোন সংশয় থাকে না। [কিন্তু তৎপরে সংশয় উপস্থিত হইলে ভ্রম নিরসনে রজ্জু ও আত্মাতে সত্যজ্ঞানই উদিত হয়।]

—কিন্তু শ্লোকে 'সন্দেহ ও বিভ্রমহরং' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—'কোন্‌টি বস্তু এবং কোন্‌টি অবস্তু'—ইহার অবধারণেই আমাদের বুদ্ধি-

---

ক "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেবিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ।" —ন্যায়দর্শন ১।২

বিপর্য্যায় ঘটে এবং তৎপশ্চাতে একদিকে সন্দেহ ও অপরদিকে ভ্রম উৎপন্ন হইয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই উভয়বিধ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বলিয়াছেন—'ভজ রামকৃষ্ণং'—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়-বিগ্রহ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম পবিত্র চরিত্র স্মরণ—মনন ও ধ্যান করিলেই রজস্তমঃজাত 'সন্দেহ ও ভ্রম' বিদূরিত হইবে। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ও তদীয় লীলাসহচর হিসাবে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের বাণী এখানে আরও স্পষ্ট। তাঁহার 'ভজ রামকৃষ্ণং'—এই বাক্যের মধ্যে আমরা যেন এই মর্ম্মই লুক্কায়িত দেখিতে পাই যে—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 'বিমলানন্দদানায়—প্রাদুরাসীন্ মহীতলে'—অজ্ঞান-তিমির হইতে তুলিয়া জ্ঞানালোকে সর্ব্বজীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যুগের জ্যোতিস্তম্ভরূপে ; অতএব ভবকর্ণধারের শরণ গ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্ব-সন্দেহ ও ভ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তি প্রদান করিবেন—ইহাই বক্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

এক্ষণে কামকাঞ্চনই সংসারগমনের হেতু এবং তাহারা শৃঙ্খলবদ্ ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব চতুর্থ শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যথা—

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তিঃ,
তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন সিষেব্যমানে।
বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতূন্,
সন্ত্যক্ত-কামকনকং ভজরামকৃষ্ণং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু যদি সদা তে অনুরক্তিঃ (ভবতি, তদা এবং বিচারয়, এষু সেব্যমানেষু তৃষ্ণাক্ষয়শ্চেদ্ ভবতি, তদৈতেষু মমানুরক্তিরস্তু। কিন্তু বিচারত উপলভ্যতে যদ্ ইন্দ্রিয়ার্থে) সিষেব্যমানে (তৃষ্ণাক্ষয়ঃ) ন (ভবতি) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) তান্

(স্ত্রীকাঞ্চনাদীন্) নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতূন্ বিজ্ঞায় সন্ত্যক্ত —কামকনকং রামকৃষ্ণং ভজ (তৃষ্ণাক্ষয়ার্থং ভক্ত্যা প্রার্থয়)।

অর্থ।—স্ত্রী, পুত্র, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতিতে যদি নিরন্তর তোমার আসক্তি থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়াও যদি তোমার বাসনার উপশম না হয়, তাহা হইলে তাহাদের (স্ত্রীকাঞ্চনাদিকে) শৃঙ্খলসদৃশ ভব-বন্ধনের কারণ জানিয়া ভোগতৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য (কাম কাঞ্চনত্যাগী) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ঐকান্তিকচিত্তে ভক্তির সহিত প্রার্থনা কর।

দীপিকা। (১) **স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু**।—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কামিনী-কাঞ্চনে ইত্যাদি। * * ইচ্ছাশক্তি-বশে সৃষ্টিকর্ত্তা পঞ্চীকরণ দ্বারা যখন ক্রমে ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, * তখন—স্থাবর, জঙ্গম, বৃক্ষাদি,—কীটপতঙ্গ ও তাহাদের

---

* শ্রুতি এই সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেন—"স তপোঽতপ্যত"—অর্থাৎ তিনি জ্ঞানময় তপঃ (মনে মনে চিন্তা করিলেন)—'একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়'—আমি এক আছি—বহু হইব,—এই 'চিকীর্ষাবশাৎ' অর্থাৎ ইচ্ছা বা কম্পন যখন তাঁহাতে সমুদিত হইল, তখন ক্রমশঃ আকাশ, বায়, তেজ, জল ও ক্ষিতি এবং

শ্রেষ্ঠ বিকাশ—মানব সৃষ্ট হইল তৎসঙ্গে। ঈশ্বর তাহাদিগের মধ্যে সৃজনীশক্তি প্রদান করিয়া 'স্ত্রী ও পুরুষ' —এই দুই মূর্ত্তিতে অর্থাৎ অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক নর উৎপাদন করিলেন। শাস্ত্রে সেজন্য 'অর্দ্ধনারীশ্বর' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥"

—মনু। ১।৩২

ক্রমে সূক্ষ্মতন্মাত্র হইতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—ইন্দ্রিয়নিচয়, স্থূল শরীর ও জগৎ উৎপন্ন হইল। সৃষ্টি সম্বন্ধে কাণাদ বলিয়াছেন—"কার্য্যকারণয়োঃ সম্বন্ধঃ"—অর্থাৎ "ঈশ্বরস্য চিকীর্ষাবশাৎ পরমাণুষু ক্রিয়াজায়তে। ততঃ পরমাণুদ্বয়সংযোগেসতি দ্ব্যণুকমুৎপদ্যতে। ত্রিভির্দ্ব্যণুকৈঃ ত্র্যণুকম্। এবং চতুরণুকাদিক্রমেণ মহাপৃথিবী, মহত্য আপঃ, মহৎ তেজঃ, মহাবায়ুঃ উৎপদ্যন্তে।" সাংখ্যকার কপিল বলেন—"পঙ্গ্বন্ধবৎ' অর্থাৎ পুরুষ হইলেন নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি জড়া বলিয়া পুরুষের প্রকাশে প্রকাশান্বিতা হইয়া হইলেন উপাদান কারণ। কিন্তু বেদান্তকার বলেন—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এক—পুরুষই যথা—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, * * * *
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" —মুণ্ডক—৭॥

—অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে শয়ম্ভূ আপনাকে দ্বিধা করিয়া—একাংশ হইতে পুরুষ ও অপরাংশ হইতে নারী সৃষ্টি করিলেন। * * পাশ্চাত্য ধর্ম্ম বা বাইবেলের উক্তি মতে—ঈশ্বর প্রথমে একটি পুরুষ সৃজন করেন—তাহার নাম 'আদম'। ক্রমশঃ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর দেখিলেন—মিথুন বা যুগ্মশক্তির সম্মিলন ব্যতীত সৃষ্টি অসম্ভব,—সেজন্য আদমের (পুরুষের) একখানি পঞ্জরাস্থি হইতে একটি রমণী সৃষ্টি করিলেন—তাহার নাম 'ইভ'। এইরূপে প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী—আদম ও ইভ সৃষ্ট হইল এবং তাহা হইতেই স্ত্রীপুরুষসকল জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল—ইত্যাদি।

পুরাণের মতে ভগবান নারায়ণ প্রজা সিসৃক্ষু হইয়া ক্রোধে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং—

"অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মান্তর্দ্দধে ততঃ
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ॥"

—বিষ্ণুপুরাণ। ৭অঃ ১১।১২

—অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বরশরীরবান অতিক্রোধন নারায়ণ 'আপনার স্ত্রী-পুরুষাকার দেহ পৃথক কর'—

এই কথা তাহাকে (ব্রহ্মাকে) বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং ব্রহ্মাও তাঁহার কথামত তাঁহাকে স্ত্রী ও পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন।' বস্তুতঃ বিরাট পুরুষের শরীরে সব খণ্ড খণ্ড স্ত্রী-পুরুষমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এক হইতেই উভয়ের উৎপত্তি; পুরুষের মধ্যেও যে শক্তি বিদ্যমান, নারীর মধ্যেও সেই শক্তি বর্ত্তমান; তবে স্ত্রী সৃজনীশক্তির আধার বলিয়া পুরাণ ও তন্ত্রে ইহাকে আদ্যাশক্তি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—এইমাত্র।

তন্ত্র বলেন—ইঁহারা ত্রিলোকপ্রসবিনী মাতৃমূর্ত্তি এবং অর্দ্ধনারীশ্বরের নারীশক্তিই—'মহাশক্তি' বা 'কালী' নামে অভিহিতা। তবে তাঁহার মতে শক্তি ও পুরুষ একই। বাস্তবিক শাস্ত্রে—

"ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং
স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহত্বমেব।
ঈশ ত্বয়াবাস্যমিদং হি সর্ব্বং
নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥"

—বলিয়া একদিকে পুরুষের যেরূপ অনন্তত্ব—অসাধারণত্ব স্বীকারে তাহাকেই জগতের আদিকারণ,

মহৎ ও সর্ব্বস্বাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীশক্তিকেও সেরূপ অন্যদিকে সর্ব্বময়ত্ব ও বিরাটত্ব প্রদান করা হইয়াছে এই বলিয়া, যথা—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পুরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরাপরোক্তি ॥"

—অর্থাৎ হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণী! জগতের উচ্চাবচ যতপ্রকার বিদ্যা আছে,—যাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে, সে সকল তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা। তুমিই স্বয়ং জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে বিদ্যমান। তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা, স্তব করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কেহ পারিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে—যে যাহার আসনে তাহাকে প্রধান করা হইয়াছে, কিন্তু আত্মসত্তা হইতে উভয়েই যখন অভিন্ন,—এ'পীঠ আর ও'পীঠ, তখন উভয়েই এক বস্তু;—কারণ আত্মা লিঙ্গ বিবর্জ্জিত.

স্ত্রীও নহেন—পুরুষও নহেন, সুতরাং কে বড়—কে ছোট নির্ণয় করা বাতুলতা মাত্র।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের এইপ্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন—'গুরো! স্ত্রী ও পুরুষ যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে 'কামিনী' বলিয়া হেয় জ্ঞান বা বর্জ্জন কাহাকেই বা করিব?'

জিজ্ঞাসু শিষ্যের যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সস্নেহে বলিলেন—'বৎস! ইহা সত্য। স্ত্রী-পুরুষভেদবিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় সত্তা জ্ঞানভূমির কথা, দ্বৈতভূমি বা ব্যবহারিক জগতে যতক্ষণ বাস করিতে হইবে, ততক্ষণ প্রকৃতি অনুযায়ী বা স্রষ্টার দ্বৈতকলার প্রতীক হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষকে ভিন্ন মানিতেই হইবে, (অবশ্য ব্যবহারিক হিসাবে,—কারণ পরমার্থতঃ তাহারা একই)।

'স্ত্রী-পুরুষ' কথা বস্তুতঃ বেদান্তোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ হইতেই জাত, এবং নাম-রূপ বর্জ্জিতে তদনুরূপই অভিন্ন। সৃষ্টি যখন হইল এবং তাহার প্রজাভুক্ত যখন আমরা হইলাম, তখনই অবিদ্যাবশতঃ দ্বৈতবুদ্ধিতে আমরা সর্ব্বত্র ভেদ দেখিতে লাগিলাম। ঈশ্বর মানবীয় উপকরণানুযায়ী পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের সমষ্টিতে মানুষ সৃষ্টি করিলেন। মনোধর্ম্মহিসাবে কামক্রোধাদি ষড়রিপু উভয়কেই (স্ত্র-পুরুষ) সমভাবে বরণ করিল। জড় ও চৈতন্যোপকরণ হইল একই,—মাত্র "অর্দ্ধনারীশ্বর'গত নরের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে নরানুযায়ী হইল পুরুষের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং নারী অনুযায়ী হইল স্ত্রীর আকৃতি ও প্রকৃতি। বিভিন্নতা কেবল মানসিক জগতের খেলা সৃষ্টিকর্ত্তা নর ও নারীকে কঠিন কোমলে তৈয়ারী করিয়া উভয়কেই সৌন্দর্য্য, লাবণ্য ও কমনীয়তা দান করিলেন—উভয় উভয়কে আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং সেজন্য নর ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা চিরন্তন! আকর্ষণ না হইলে মিলন অসম্ভব! চুম্বক লোহাকে টানে—যেহেতু তাহার আকর্ষণী শক্তি আছে; নর ও নারীর পক্ষেও ঠিক তাহাই। এই আকর্ষণ লইয়াই সংসার,—অন্যথা সংসার বা সৃষ্টি থাকিত না।

সংসার শাস্ত্রের চক্ষে কিন্তু বাসনার আবাস বা বন্ধন বলিয়া পরিগণিত। মুমুক্ষু—সকলের পারে যাইতে ইচ্ছুক, তিনি জগতের কোন দ্রব্যই গ্রাহ্য করেন না, তাঁহার পক্ষে জড়ের মিলনে শান্তি উপভোগ অতি

তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত! তিনি চান চেতনের সহিত মিলন করিতে। চৈতন্য সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান এবং চৈতন্যই আত্মা; ঐ চৈতন্যকে উপলব্ধি করিবার জন্যই জড়ের খাঁচা ভুলিতে হয় বা আকর্ষণের ফাঁদ এড়াইতে হয়। তন্ত্রে যে নারীর মধ্যে আদ্যাশক্তির রূপদর্শনের কথা আছে বা মাতৃশক্তির সন্দর্শন-রহস্য কথিত আছে, তাহা ঐ নারীর জড়াবরণ শরীরটাকে ত্যাগ করিয়া চৈতন্যসত্তা আত্মার সন্দর্শনেই অধিষ্ঠিত!

সাধারণতঃ ব্যবহারিক জগতে নরনারী মোহাচ্ছন্ন, কারণ মোহ বা মায়াচ্ছন্ন না হইলে সৃষ্টির উদ্ভব সম্ভব হইত না,—মায়াতীত হইলে সকলেই স্ব স্বরূপে অবস্থান করিত। কিন্তু ঐ মিথ্যাবরণ মায়াটুকু বরণ করিয়াই যত গোল। এই জগতে, সৃষ্টির অথবা দ্বৈতের মধ্যে পড়িয়া অদ্বৈতের বা সৃষ্টির অতীতাবস্থা লাভ করিবার জন্যই সৃষ্টির প্রয়োজন। সুতরাং মায়ারাজ্যে নরনারী বলিদানের উপকরণ স্বরূপ; বন্ধন তাহাদের আছেই,—কাজেই দোষবিবর্জ্জিত হইবারও উপায় নাই এবং এই নিমিত্তই নর নারীকে আকর্ষণ করিয়া নিজেকে জড়ীভূত করিয়া ফেলে এবং বাসনার বশে সংসার সৃষ্টি করিয়া বসে; তখন জড়কে জড় বলিয়া

তাহাদের আর জ্ঞান থাকে না, চৈতন্যসত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া জড়কেই সর্ব্বস্ব জ্ঞানদ্বারা আপন করিয়া লইয়া, তাহার প্রাপ্তি ও বিলয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।

শাস্ত্র সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বকেও বন্ধন বলিয়া অভিহিত করেন, এইজন্য মুমুক্ষুকে সুখদুঃখের পারে যাইয়া দ্বন্দ্বাতীত হইতে হইবে; আর ইহাও সত্য যে—সুখ যাহা, যথার্থতঃ তাহা লাভ হয় একমাত্র জ্ঞান বা ব্রহ্মানন্দানুভূতিতেই!

অতএব 'কামিনী ত্যাগ কর' অর্থে মুমুক্ষু মাত্র কামরূপিনী স্ত্রীর মায়া—মমতা ও আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিবেন—দ্বেষ বা হেয় বুদ্ধি লইয়া নয়, পরন্তু 'মাতৃভাবে হেরিয়া সকলে' বা 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু,'—এইরূপ দর্শনে! রমণীমাত্রকে মাতৃজ্ঞানে দর্শন করিয়া জড়দেহের সংসর্গে ক্ষণিকানন্দের বাসনা ত্যাগ করাকেই কাম বা কামিনী ত্যাগ বলে:—অর্থাৎ নারিগণের প্রতি কামভাবে দর্শন না করিয়া 'তাহাদিগকে আমার করিয়া' লইয়া জড় দেহটাকে সর্ব্বস্ব না ভাবিলেই হইল; কারণ মাতৃভাবে দর্শন করিয়া রমণীর সংশ্রব ত শাস্ত্র হেয় প্রতিপন্ন করেন

নাই? (তবে এইভাব হৃদয়ে রোপন করিতে সাধনার প্রয়োজন অথবা অপর কথায় বলা যায় ঈশ্বরানুগ্রহসাপেক্ষ।)

সাধারণতঃ মানুষ কিন্তু রমণীকে উপভোগের বস্তু জ্ঞানে নিজ অপেক্ষা তাঁহাদের হেয় মনে করেন এবং সেজন্য দেখা যায়—ব্রাহ্মণ্যযুগের ফলস্বরূপ আজিও নারীকে বেদাদি শাস্ত্রাধিকার হইতে বঞ্চিতা রাখা হইয়াছে। বৈদিকযুগে কিন্তু এরূপ ছিল না; তখন পুরুষ ও নারীর অধিকার প্রায় সমানই ছিল,—তাই আজিও গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, বিশ্ববারা, ক্ষণা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদূষী ও মন্ত্রদ্রষ্টৃ বীরবালাগণের নাম ইতিহাস পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে শোভা পাইতেছে। গার্গী জনকের রাজসভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সগর্ভে ব্রহ্ম-মীমাংসায় আহ্বান করিয়াছিলেন; মন্ত্রদ্রষ্টৃ জিস্তৃণ-ঋষির বাঙ্‌নাম্নী কন্যা দেবীসূক্তের রচয়িতা,—আজিও তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রতীকরূপে তাঁহাকে জগতের ঘরে ঘরে পূজা করা হইতেছে; ক্ষণা সগর্ভে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় জ্যোতিষের অপূর্ব্বগণনা প্রদর্শন করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি! স্ত্রীজাতি মাতৃজাতি —আদ্যাশক্তিরূপিনী! কিন্তু তাহা ভুলিয়া—

সত্যকে মিথ্যাবরণে চাপা দিয়া—মাত্র তাঁহাদের ভোগের সামগ্রী করিলে চলিবে কেন? তন্ত্রকার বলিয়াছেন—

"স্ত্রিয়োদেবাঃ স্ত্রিয়ঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণং।
স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাসু নিন্দাং প্রহারকং॥

অথবা প্রজাপতি মনু বলিতেছেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী একস্থানে বলিয়াছেন—"নারীর সম্মান—নারীর ন্যায্য অধিকার না দিয়া তাহাকে বন্দিনী—মাত্র উপভোগের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করাতেই আমাদের সমাজের এত দুর্দ্দশা!" শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীও ক্ষোভে বলিয়াছেন এইজন্য—'কিন্তু হায়! নারীর পূজা অর্থে মানুষ বুঝিয়াছে এখন নারিগণের রূপযৌবনের পূজা। কিন্তু তাহা নহে, ইহার প্রকৃতার্থ হইতেছে—জগতের সমস্ত রমণীকে মাতৃবৎ দেখিয়া তাহাদের পূজা অর্থাৎ ভক্তিকরা।' * * শ্লোকে 'স্ত্রীষু'—স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি ও রূপ-যৌবনের পূজা—এই নিন্দনীয়ার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে

এবং তৎত্যাগই মুমুক্ষুগণের একান্ত কর্ত্তব্য—ইহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তৎপরে আসিতেছে "কাঞ্চন"! কাঞ্চনার্থে… অর্থ বা ধন *, যে ধনে বাড়ী, খাওয়া পরা—ইন্দ্রিয়-সুখের চরিতার্থ সম্পাদন হইয়া থাকে। ইহা লোভ ও মোহের একটি প্রধান উপকরণ, সেজন্য শাস্ত্র ইহাকে 'অনর্থ' আখ্যা দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্॥"

—হে ধনলুব্ধ বিষয়ি! তুমি যে ধনের জন্য সাকারা ঈশ্বরী মাতাকে মাতৃজ্ঞান কর না, পিতৃ-ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিতেও দ্বিধাবোধ কর না, নরকের বিভীষিকাকে স্বর্গের আলোক বলিয়া ভ্রমের পথে ছুটিয়া চল, তাহাকে "নিত্যম্"—প্রতিনিয়ত অনর্থজ্ঞান কর। কেন? না—তাহাতে যথার্থ সুখ বা শান্তি নাই,

* স্বামী বিবেকানন্দজী—কাম-কাঞ্চনকে Lust and Gold আখ্যা দিয়াছেন।

পরন্তু দুঃখ ও অশান্তির জ্বালাই ক্রমাগত রহিয়াছে। শাস্ত্র বলেন—

"অর্থানাম্ অর্জ্জনে ক্লেশস্তথাচ পরিরক্ষণে।
আয়ে ক্লেশো ব্যয়ে ক্লেশো ধিগর্থান্ ক্লেশদায়িনঃ॥"

—অর্থাৎ ধন অর্জ্জন করিতে কষ্ট, রক্ষা করিতে কষ্ট এবং ব্যয় করিতেও কষ্ট,—অতএব যাহার উপায়, রক্ষণ ও ব্যয়ে এত দুঃখ, তাহা কি কখনও সুখের হইতে পারে? লোকে বলে—'টাকা গোল, ইহা লাগায়ও গোল'—ইহা অতি সত্য কথা; কারণ তস্কর ও আত্মিয়স্বজনাদি হইতে ধনশালীর শঙ্কা যথেষ্ট, ইহা সঙ্গে থাকিলে পথিকেরও মৃত্যুভয় পদে পদে!

অর্থলোভাদির সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন —'বিষভোজনমিব বিপরিণামদুঃখাঃ'—অর্থাৎ বিষ ভোজনের ন্যায় দুঃখে ইহাদের পরিণতি। ধনের মোহ এমনই যে—ইহাতে পরার্থপরতা অনেক ক্ষেত্রে বলি দিতে হয় এবং ইহা মানুষকে পশুতুল্য বিবেকবুদ্ধিহীন করিয়া তুলে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ধনের বা কাঞ্চনের আশা ত্যাগ করিবেন। এই কাঞ্চন ও কামের প্রতি বীতরাগ হইবার জন্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিতেছেন—

"হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পায় না। বৈরাগ্য—বিষয়বিতৃষ্ণা না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে 'ন সিধ্যতি ব্রহ্ম শতান্তরেঽপি"—ব্রহ্মের কোটীকল্পেও জীবের মুক্তি নাই।" *

* পণ্ডিত অঘোর নাথ কাব্যতীর্থ প্রণীত একটি গান প্রদত্ত হইল। ইহাতে কামিনী-কাঞ্চনের একটি নিখুঁৎ ছবি আঁকা হইয়াছে। যথা—

'হায় কি মজার ধন—কামিনী কাঞ্চন।
(এর) একটাতেই রক্ষা নাই আবার—দু'টির সম্মিলন॥
(এরা) মজার বিধির সৃষ্টি, মজায় করে সুধাবৃষ্টি
বুঝতে দেয় না টক্‌ কি মিষ্টি, এম্‌নি সংযোজন॥
ওদের নেশায় মজে যে'জন, হয়—চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ সে'জন
বিলাসের বিছানায় শু'য়ে, দেখে সুখের স্বপন।
নেশার্‌ ঘোরে হয়ে বিভোর্‌,
ধরা দেখে সরার্‌ মতন॥
কামিনী কাঞ্চনের আশা,
মিটে না যার ঘোর পিপাসা,
অন্তরে বাসনার বাসা—মিটে না কখন্‌।
কেবল, ভোগে ভোগে ভুগে মরে,
ভোগে যায় আকিঞ্চন॥

কামিনী-কাঞ্চন লইয়াই সংসার,—সুতরাং এই অর্থ ও কাম যে স্থানে বিদ্যমান থাকিবে, পরমার্থ ও রাম সেখানে থাকিতে পারে না—'যাঁহা কাম, তাঁহা নেহি রাম।' শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিয়াছেন —'যারা বলে এ সংসারও কর্‌ব—ব্রহ্মজ্ঞও হব, তাদের কথা আদপেই নিবি না। একুল ওকুল দুকুল রেখে—দু'নায়ে পা দিয়ে পার হওয়া যায় না। জনক রাজা ক'জন হ'তে পারে? জনক প্রথমে হেটমুণ্ডে—পঞ্চতপা হয়ে কত বর্ষ কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে—মাখম হয়ে সংসাররূপ জলে মিশে রাজ্যশাসন করেছিলেন এবং সে'জন্যই তিনি বল্‌তে পেরেছিলেন—

অনন্তং যত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন॥

—মহাভারত। শান্তিপঃ ১৭৮

—অর্থাৎ আমার এই অনন্ত বিত্ত আছে বটে, অথচ আমার কিছুই নাই। মিথিলা সমস্ত দগ্ধ হইয়া যাইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না এবং তাহাতে আমার কিছুই আসে যায় না।' ব্রহ্মজ্ঞ জনকের এই

কথা কে বল্‌তে পারে? অতএব ত্যাগ—ত্যাগ—'নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,—সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।' * * শ্রুতিও তাই বলেছেন 'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।'—ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে,—একমাত্র 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।" (ক)

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপাসনা প্রণালীও ছিল ঠিক তাহাই। তিনি সমস্ত রমণীকেই আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে দর্শন করিতেন। কাঞ্চন তিনি স্পর্শই করিতে পারিতেন না; এমন কি ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার অঙ্গুলিসকল বক্র হইয়া যাইত। জননী বলিয়া সমস্ত রমণীকে এবং মাটি বলিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসমুদ্রের তলদেশে গমন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। * * 'কামিনী-কাঞ্চন মুক্তি পথের অন্তরায়স্বরূপে ত্যাগ করা বিধেয়'—এই অর্থেই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিয়াছেন 'স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তে অনুরক্তিঃ'—অর্থাৎ

(ক) "ন কর্ম্মনা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥"
—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।১৪শ উঃ ১৩৫

অনুরাগ বা আসক্তি থাকে এবং 'তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন সিবেব্যমানে,'—পুনঃ পুনঃ কাম-কাঞ্চন ভোগ করিয়াও যদি না তোমার তৃষ্ণা বা বাসনার শান্তি হয় ইত্যাদি ;—অর্থাৎ মুক্তিকামী মাত্রেরই ভোগকালে এইরূপ বিচার করা উচিত যে—'আমি—যে বিষয় ভোগ করিতেছি, ইহা যথার্থ কি আমাকে শাশ্বতানন্দ দান করিতে পারিবে, অথবা ইহা ক্ষণিক বিকৃতানন্দ ?'—এবং এই বিচারদ্বারা যদি তিনি দেখেন যে তাহা প্রকৃত আনন্দ না দিয়া মায়িক প্রলোভনেই তাহাকে বন্ধন করিবে, তবে উচিত—তৎক্ষণাৎ সেই ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য ও শাশ্বতানন্দের দিকে তাহার ধাবিত হওয়া ! শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কাম-কাঞ্চনলালসার মোহিনী-মায়া দর্শন করিয়াই তাহাকে '**নিগড়বদ্**'—অর্থাৎ শৃঙ্খলস্বরূপ ও '**ভববন্ধহেতূন্**'—সংসার-বন্ধনের কারণ '**বিজ্ঞায়**'—অর্থাৎ জানিয়া কামকাঞ্চন ত্যাগী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা করিতে বলিয়াছেন ; কারণ 'ক্ষণমিহসজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা'; তাঁহার নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই এই ভোগবাসনার প্রবাহ বিনষ্ট করিয়া তিনি শান্তি প্রদান করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

এক্ষণে আচার্য্যদেব ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক কার্য্যাদির কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র ও সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন, যথা—

ভার্য্যামশেষগুণভূষিত ভক্তিযুক্তাং
যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তথৈব।
দূরাৎ প্রণম্য জিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা,
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ। য উ (হি) অশেষগুণভূষিতভক্তিযুক্তাং (নিখিলকল্যাণগুণালঙ্কৃতাং ভক্তিমতীঞ্চ) ভার্য্যাং তথৈব (তেনৈব প্রকারেণ) সকলাং কামবশগাং (কামুকীম্) যোষাং (স্ত্রিয়ং) চ দূরাৎ (বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ) মাতৃবুদ্ধ্যা (ইমাঃ সর্ব্বা এব জগদম্বয়ামূর্ত্তয়—ইতি মতিং কৃত্বা) প্রণম্য (স্বাবধিক প্রকর্ষখ্যাপনামুকুলব্যাপারবিশেষ

বিষয়ীকৃত্য) জিতবান্ (তা যোষা এব অভিভূতবান্ ন তু তাভিরভিভূতঃ) তং কামগন্ধ রহিতং (বুভুক্ষালেশে-নাপিহীনং) রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্গুণশ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহ প্রত্যয়ৈকতানতয়া সমু-পাস্স্ব) ॥

অর্থ। যিনি সর্ব্বগুণভূষিতা ভক্তিযুক্তা পত্নী ভোগসুখে অনুরক্তা বহু যুবতীগণকে জগজ্জননীর মূর্ত্তিজ্ঞানে দূর হইতে প্রণাম করিয়া সম্যক্রূপে বিজিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন, সেই কামগন্ধহীন নির্মল-সত্ত্বময়-বিগ্রহ-শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমল চরিত্র একান্ত হইয়া শ্রবণ—মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা শান্তি লাভ কর

দীপিকা। (১) ভার্য্যামশেষ ইত্যাদি।— ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কামারপুকুরগ্রামে সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (ইং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী) শুক্লপক্ষ-বুধবার দ্বিতীয়াতিথির শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেন। * তাঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান ও

---

* এখানে পাঠকপাঠিকাবর্গকে আচার্য্য শঙ্করের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে—'অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্য শুদ্ধ-

সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবী দেব-দেবীপরায়ণা—সাধ্বী ও লজ্জাশীলা রমণী ছিলেন।

ভক্ত ক্ষুদিরাম পিতৃগণের পিণ্ডদানোদ্দেশ্যে যখন ৺গয়াধামে গমন করেন, তখন অপূর্ব্ব এক স্বপ্ন দর্শন ও ভগবদ্বাণীর ফলে—তিনি স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্নে তিনি দেখিতে পান—জগৎপতি নারায়ণ মন্দিরতলে জ্যোতির্ম্ময়-সিংহাসনোপরি আসীন হইয়া হাস্যবদনে তাঁহাকে বলিতেছেন—'ক্ষুদিরাম! তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্য পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।' —বাস্তবিক, ক্ষুদিরাম ৺গয়াধাম হইতে কামারপুকুরে ফিরিয়া যখন শুনিলেন ও দেখিলেন যে—সাধ্বী চন্দ্রমণিও বাটীর সম্মুখস্থ শিবমন্দির প্রাঙ্গনে 'শান্তিনাথ মহাদেবের' স্বর্গীয় জ্যোতিস্রোতপ্রভাবে গর্ভসম্ভবা হইয়া মানবী হইতে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, তখন বুঝিলেন সত্যই ভগবান তাঁহাকে

বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া '**দেহ বানিব জাত ইব**' চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্নিব—ইত্যাদি।'

—শাঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা।

কৃতার্থ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন, এবং যথার্থ পাইলেনও এক দেবনিন্দিত চারুদর্শন পুত্র, যে পুত্র উত্তরকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সাধন-জগতে এক অমানব লীলার সমাপ্তি সাধনে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বাণী ঘোষণা করিয়া জগৎকে ভবপারের অপূর্ব্বপন্থা প্রদর্শন করিয়া গেলেন এবং যে পুত্র আজ সমগ্র জগতের নরনারিগণের জ্যোতিস্তম্ভ হইয়া যুগের ঠাকুররূপে প্রাণের অর্ঘ্যে পূজিত ও বন্দিত হইতেছেন।

৺গয়াধামের শ্রীশ্রীগদাধরের স্বপ্নপ্রসূত বলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যকালের নাম ছিল 'গদাধর'। পিতা ক্ষুদিরামের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুরে ও তৎপরে দাক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন এবং তথায় তাঁহার সাধন-জীবনের প্রারম্ভ ও উদ্‌যাপন হয় শ্রীশ্রীজগত্তারিণীকে সজীব মাতৃমূর্ত্তিতে লাভ করিয়া। তৎপরে রামকুমার স্বর্গে গমন করিলেন এবং দৈবচক্রে পুনরায় তাঁহাকে কামারপুকুরে আসিতে হইল। মাতা চন্দ্রমণিদেবী শুনিয়াছিলেন পুত্র তাঁহার পাগল হইয়াছে, তাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহার

জীবন-প্রবাহ পরিবর্ত্তিত করিতে তিনি চেষ্টা পাইলেন এবং মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের চেষ্টায় কৃতকার্য্যও হইলেন।

কামারপুকুরের পার্শ্ববর্ত্তী এবং বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীমতী সারদা দেবীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবাহ হইল। এ বিবাহ অনিচ্ছাসত্ত্বে না হইয়া বরং তাঁহার নির্দ্দেশমতই হইয়াছিল, কারণ উপযুক্তা পাত্রীর অনুসন্ধানে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ও অন্যান্য সকলে যখন অকৃতকার্য্য হন, তখন তিনি বলেন পাত্রী তাঁহার কুটা (তৃণ) বাঁধা আছে এবং উক্ত জয়রামবাটীস্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাই তাঁহার নির্দ্দিষ্টা পাত্রী।

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যাহা—সংসার করা, তাহা আর হইল না। তিনি কামারপুকুর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণি—যাঁহাকে বলিতেন তিনি 'অষ্টসখির অন্যতমা', তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবমন্দিরশোভিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরপার্শ্বস্থ পঞ্চবটীতলে বাস করিয়া পুনরায় দিবারাত্র সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী সারদা দেবী যখন ক্রমশঃ বড় হইয়া বুঝিলেন—তাঁহার আরাধ্য

দেবতা একমাত্র স্বামী, স্বামীর চরণতলই তাহার একমাত্র সম্বল ও আশ্রয়, তখন পিতার সহিত সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। লোকে কত কি বলিল—'তোর স্বামী পাগল হইয়াছে' ইত্যাদি; কিন্তু শ্রীমতী সারদাদেবী সকল কথা বিস্মৃত হইয়া স্বামীর চরণতলকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন এবং দাসীরূপে সেবাধিকার লাভ করিয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক পার্শ্বে বাস করিতে অধিকার ভিক্ষা করিলেন। করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নীকে পত্নীরূপে না দেখিয়া সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তিজ্ঞানে প্রণাম করিলেন এবং নহবৎঘরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার পার্শ্বে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'বিবাহের পর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) ব্যাকুল হয়ে ধরেছিলাম যে—'মা! আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করে দে।' মা সত্য সত্যই সেই কথা শুনিয়াছিলেন, কারণ শ্রীশ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বামীর স্থানে জগতস্বামীরূপে দর্শন করিয়া পূজা করিতেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহাকে 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু',—সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তিরূপিণী ভগবতীজ্ঞানে

দর্শন করিতেন। দৈনন্দিন জীবনে তিনি পত্নীকে গৃহকর্ম্ম হইতে ঈশ্বরচিন্তা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রতিদিনই সজাগ করিয়া বলিতেন—"দেখ, চাঁদা মামা যেমন্ সকল শিশুর মামা, ঈশ্বরও তেমন্ সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাক্‌বার অধিকার সকলেরই আছে, যে ডাক্‌বে —সেই কৃতার্থ হবে তুমি ডাক তুমিও পাবে।"

শ্রীশ্রীসারদাদেবী একদিন রাত্রিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পদসেবাকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা, আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর করিয়াছিলেন "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস কচ্ছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা কচ্ছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখ্‌তে পাই।"

সর্ব্বগুণযুক্তা পত্নীকে তিনি চিরদিন জগজ্জননীর আসনে অধিষ্ঠিতা করিয়াই পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধই ছিল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের চিরসহচররূপে! কত বর্ষ অতীত হইয়াছে, কত শান্তিময়ী রজনী কাটিয়া গিয়াছে পবিত্রজাগরণে,

শ্রীশ্রীমা

জগতের অপূর্ব্ব মানব ও মানবী তাঁহাদের সুখের নিশি কাটাইয়াছেন শান্তিভরা প্রাণে—কেবল ভগবদ্‌প্রসঙ্গ, ধ্যান ও আদর্শজীবন গঠনকরণী অমৃতময় উপদেশ-বাণী লইয়া! দেহের সহিত দেহের সম্বন্ধ তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, প্রেমের আলোকচ্ছটায় কাম তাঁহাদের আলোকস্নাত হইয়া প্রেমঘনেই পরিণত হইয়াছিল; এইজন্য ষোড়শী লাবণ্যপ্রতিমাকে সম্মুখে রাখিয়াও কখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামভাব জাগিত না, কামকে পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপে চিরতরে তিনি শ্রীশ্রীমাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠার্দ্ধের একদিন ফলহারিণী কালীপূজার ঘোর অমানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগন্মাতার ষোড়শীমূর্ত্তিতে পূজা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একটি আলিপনাশোভিত পীঠ শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উপবেশনের জন্য স্থাপিত হইল, পূজার আয়োজনে দক্ষিণেশ্বরস্থ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর পূজক দীননাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে পত্নীকে তিনি বসিতে ইঙ্গিত করিলে—মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় শ্রীশ্রীসারদাদেবী পীঠোপরি উপবিষ্টা হইয়া অর্দ্ধবাহ্যদশায় চিত্রাপিতের ন্যায় অবস্থান

করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রপূত জলদ্বারা শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে শ্রীশ্রীজগদম্বাজ্ঞানে অভিষিক্ত করিলেন এবং চন্দনসিক্ত পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলি লইয়া গভীরধ্যানে মগ্ন হইলেন। তখন কে কাহাকে দেখিবে? স্তিমিত অমানিশা-রজনী, ঝিঁঝিঁপোকা অদূর জাহ্নবীসৈকত ও বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীতির ঢক্কা বাজাইতেছে,—খদ্যোতমালা তারার বাতি জ্বালিয়া বাতাসের তালে তালে নাচিতে নাচিতে করালী কালীর প্রলয়াভিযানের অভিনয় করিতেছে; —আর এদিকে প্রদীপের ক্ষীণালোকতলে ষোড়শী প্রতিমা ও তৎপূজক অপরূপ জ্যোতির্বিমণ্ডিত হইয়া ধীর—স্থির ও গভীর সমাধিতে মগ্ন রহিয়াছেন! কতক্ষণ এইরূপ নীরবতার মধুময়-মিলনে অতিবাহিত হইল, বাহ্যপূজার সম্বন্ধ বিদূরিত হইল, অতীত অজানা এক আনন্দময় দেশে—অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের প্রেমের পূজা সমাপ্ত হইতে লাগিল! তাহার পর—ধীরে ধীরে বাহ্যজগতে মন নামিয়া আসিল, করজোড়ে—ভক্তিভরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূজাসমাপন করিয়া প্রণাম করিলেন—

'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকেগৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥'

উহাই তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজা। তন্ত্র বলেন—'শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ',—যাবতীয় স্ত্রী শ্রীশ্রীজগন্মাতা প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি এবং যাবতীয় পুরুষ জগন্নিয়ন্তা শিবের প্রতিমূর্ত্তি! প্রত্যেক রমণীকে পুরুষের চক্ষে জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি প্রতীয়মানকল্পে এবং পুরুষকে নারীর চক্ষে সাক্ষাৎ শিব প্রতিপন্নকল্পে তন্ত্রের উদ্ভব এবং এই জন্যই উভয়ে উভয়ের পূজ্য ও পূজা। উভয়ে উভয়ের পূজায় ব্যাপৃত থাকিলে—জ্ঞাতে না অজ্ঞাতসারে সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা হয়।

কিন্তু তন্ত্রোক্ত এই ধারা কয়জন মানিয়া চলেন? সম্পূর্ণ কামজিৎ হইয়া স্ত্রী-শরীরে জগন্মাতার মূর্ত্তিকল্পনা করা কি সাধারণ মানবের কার্য্য? ইহা একমাত্র জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বত্যাগী অধ্যাত্মমার্গাবলম্বীগণের পক্ষেই সম্ভব! বিবাহিতা স্ত্রীকে ভোগ্যা না করিয়া পূজ্যা করিয়া লইবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে পাই ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃত-চরিত্রে! গৌতমবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি অবতারগণ বিবাহ করিয়া—পরে বিবাহিতা পত্নীর মায়া ও আসক্তি কাটাইয়া বৈরাগ্যাবলম্বনে গৃহত্যাগ করেন,

শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর বিবাহ করেন নাই,—কিন্তু সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রে আমরা অতুলনীয় সংযম দেখিতে পাই। স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কিম্বা দূরে রাখিয়া নহে, স্বীয় শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া কত রজনী তিনি ভগবদ্ আলোচনায় ও উপদেশপ্রদানে অতিবাহিত করিয়াছেন। সংসারের খুঁটীনাটি হইতে আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে উপদেশ প্রদান করিতে বাকি রাখেন নাই। উত্তরকালে প্রসঙ্গচ্ছলে শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভক্তবৃন্দকে বলিতেন—'ওরে! তাঁর উপদেশের কথা আর কি বল্‌ব? প্রদীপের সল্‌তেটি উস্কান হ'তে ভগবদ্‌সাধনা পর্য্যন্ত তিনি আমায় হাতে নাতে শিখিয়ে গেছেন।' আহা! শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অপূর্ব্ব-শিক্ষাদানের অন্তরেই লুক্কায়িত রহিয়াছে যেন সেই মহাত্মাগণের সাঙ্কেতিক বাণী—'পতি পরম গুরু',—অর্থাৎ পতিই স্ত্রীর যথার্থ গুরু। কি সংসার—কি অরণ্য, কি বিপদ—কি সম্পদ, কি বহির্জ্জগৎ—কি অন্তর্জ্জগৎ, সর্ব্বক্ষেত্রেই রমণীর জ্বলন্ত চালক হইতেছেন 'পতি'।

সর্ব্ববিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে অধীনা (আশ্রিতা) সঙ্গিনীকে তদুপযোগিনী করণে কর্ত্তৃত্ব করার

নামেই ত 'পতি' কথার তাৎপর্য্য নিহিত! কিন্তু দুরদৃষ্ট-সমাজের পক্ষে তাহার তাৎপর্য্য দাঁড়াইয়াছে মাত্র তাহার অবাধ ভোগকর্ত্তৃত্বে! পুরুষ চান্ রমণীকে তাঁহার সাহায্য ও সম্ভোগের জন্য; কিন্তু একবারও তাঁহারা যথার্থ কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বিবাহিত হইয়াও অবিবাহিতের ন্যায় আকুমার ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদনে জগৎকে দেখাইয়াছেন—'বিবাহ অর্থে সম্ভোগ নহে, পরন্তু বিবাহার্থে হইতেছে—বিবাহিতাকে সংসারিক হইতে আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে উন্নীতকরণের পূর্ণ-দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তাহাকে সংসারের সহিত সংগ্রামোপযোগিনী করিয়া যথার্থ কল্যাণ যাহা—সেই আত্মসাক্ষাৎকারের অধিকারিণী করা। তিনি দেখাইলেন যে—বিবাহ করিয়াও সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়, বিবাহ করিয়াও সপ্রেম সম্বন্ধে সংসারিক ও আধ্যাত্মিক-কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা সম্ভব! কিন্তু কিরূপে সম্ভব? ইহার প্রত্যুত্তর তাঁহার অদ্বৈতবাদী গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীই প্রদান করিয়াছেন, যথা—স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া দর্শন করেন, তাহার পক্ষেই সম্ভব! ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে

ইহা স্বাভাবিক ছিল। তিনি আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে জগজ্জননীমূর্ত্তিতে যে কেবল পূজা করিতেন—তাহা নহে, পরন্তু—

(২) যোষাশ্চ কামবশগাং.......................... মাতৃবুদ্ধ্যা। —অর্থাৎ জগতের যত রমণী তাঁহার চক্ষে সাক্ষাৎ মা শ্রীশ্রীভবতারিণীরূপে প্রতীয়মান হইত। * * * একবার সাধন সময়ে যখন তাঁহার শরীরে যোগজ বিকারসমূহ উপস্থিত হইল, তখন শ্রীমতী রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামতা শ্রীযুক্ত মথুরমোহন ভাবিলেন—অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য ধারণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক অসুস্থতা ও উন্মাদ-লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং এই অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলেই ঐ সকলের উপশম হইবে,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুক্ত মথুরমোহন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মচর্য্য-ভঙ্গকল্পে তাঁহাকে লইয়া কলিকাতার মেছুয়াবাজার-পল্লীস্থ খ্যাতনাম্নী বারনারী লছমীবাই সন্নিধানে গমন করিতে মনস্থ করিলেন এবং তজ্জন্য শ্রীযুক্ত মথুর পূর্ব্ব হইতেই ইহার আভাস লছমীবাইকে প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে যাইবার ছলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া মথুর পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট

মেছুয়াবাজারস্থ বারনারী ভবনে উপস্থিত হইলেন। লছমীবাই পূর্ব্ব হইতেই অপূর্ব্ববেশভূষায় সজ্জিতা হইয়াছিল; শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মথুরামোহন একটি ঘরে উপবেশন করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে একাকী তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি বাহিরে গমন করিলেন। এখানে লছমীবাই মথুরের নির্দ্দেশমত মোহিনীরূপে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার হাবভাব দেখাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রলোভিত ও মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। তখন রাত্র হইয়াছে, ভাবোন্মত্ত শ্রীশ্রীঠাকুর কামুকার সেই মোহিনীরূপ দর্শনের পরিবর্ত্তে দেখিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতার ভুবনমোহিনী স্বর্গীয়রূপ; তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিচ্ছটায় তাঁহার মুখ-মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অর্দ্ধবাহ্যদশায় করজোড়ে তিনি 'মা! মা! তুই অসতী মা! তোকে কোটী কোটী প্রণাম করি"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। লছমীবাই প্রমুখ বারবিলাসিনীগণ এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিতা ও লজ্জিতা হইয়া গেল, নিমেষ মধ্যে তাহাদিগের মন হইতে কামভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকের ন্যায় অবস্থা দর্শন করিয়া তাহারা বাৎসল্যভাবে অভিভূতা

হইয়া এবং পরক্ষণে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। * * মথুর অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, লছমীবাই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সজলনয়নে বলিল—'আপনি কাহাকে পরীক্ষা করিতে আমায় পাঠাইয়াছিলেন? উনি মহাপুরুষ, ওঁর চরণধূলায় আমার মত সহস্র সহস্র পাতকী উদ্ধার হইয়া যায়—ইত্যাদি।' শ্রীযুক্ত মথুর শুনিয়া স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

আর একটি ঘটনা; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বহু সাধক ও ভক্ত তাঁহাদের স্ব স্ব সাধনমার্গানুকূল উপদেশ লাভ করিবার জন্য প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন। পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও তাঁহাদের অন্যতম। পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়ের আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন। কলিকাতার উত্তরে কাছিবাগানে তাঁহাদের আখড়া ছিল। তথায় বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধন ভজন করিত। পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের একবার ইচ্ছা হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তথায় লইয়া যান্ এবং সেইমত তিনি একদিবস তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। বালকস্বভাব শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতের কথায় সম্মত হইলেন এবং একদিন উভয়ে কলিকাতা

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে বৈষ্ণবচরণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া আখড়ায় উপস্থিত হইলে—তত্রস্থ সকলেই তাঁহার নির্ব্বিকারচিত্ত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব ও ভগবদ্‌প্রেম দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক—তিনি যথার্থ ইন্দ্রিয়জয়ী কি না দেখিবার জন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইল এবং সম্পূর্ণ পরাজিতা হইয়া ভক্তিগদগদচিত্তে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল—তিনি অটুট সহজ—আনন্দময় পুরুষ। আহা! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অভূতপূর্ব্ব জিতেন্দ্রিয়তার নিদর্শনে আত্মহারা হইয়া আমরাও তৎসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইব—তিনি সত্যই আনন্দময় পুরুষ—নির্ব্বিকারচিত্ত মহামানব!

সকল রমণীর প্রতি মাতৃত্বের আরোপ না করিলে কখনও কাম দমন হইতে পারে না—ইহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়া গিয়াছেন। এই ভাব একমাত্র উচ্চস্তরের সাধকহৃদয়েই প্রকাশ সম্ভব; কারণ সকলের মধ্যে এক আত্মসত্তার অনুভব ব্যতিরেকে অর্থাৎ আত্মদর্শী ব্যতীত এই মাতৃভাব পোষণ করিতে সক্ষম হন না। কিন্তু তাহা হইলে ত বলা যায়—মহাত্মা বা তন্ত্রকারগণ কেন এইরূপ অধিকারী অনধিকারী বিচার

না করিয়া সকলের প্রতি মাতৃত্বারোপের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন? ইহা কি তাঁহাদের বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত বিলাপধ্বনি নহে? যথার্থ জ্ঞানী ও সাধক বলিবেন—না, তাহা নহে, তাহাদের কথা যথার্থই মূল্যবান। তাঁহারা প্রাথমিক সাধনস্তর ব্যক্ত না করিয়া একেবারে ফল বা অনুভূতির কথাই লোক-গোচরীভূত করিয়াছেন, তাই বুদ্ধিমান সাধককে তাহা বুঝিতে হইবে ক্রমিক সোপানের ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া এবং বহিঃ হইতে অন্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণ হইতে অসাধারণের সাধন ও অনুভূতি লইয়া! কিন্তু তাহা হইলে সেই সাধারণ হইতে অসাধারণে যাইবার পন্থাই বা কি? তন্ত্রমতাবলম্বী বলিবেন তাহা দুই উপায়ে সাধিত হয়। প্রথম—আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন সাধক; শক্তি বা প্রকৃতির প্রতীকস্বরূপা তাঁহার উপাস্যা দেবীমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারই প্রতিকৃতি সর্ব্ব রমণীতে আরোপ করিবেন এবং তাহা হইলে মনুষ্যবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া বিসদৃশভাব এককালে বিলুপ্ত হইবে;—কারণ শ্রদ্ধাবনত সাধক সন্তান হিসাবেই তাঁহার আরাধ্যা দেবী বা জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া অন্তরের আবেদন-নিবেদন উপস্থিত করেন, সুতরাং স্বর্গীয় মাতৃবুদ্ধির

জাহ্নবীধারাই সেখানে প্রবাহিতা থাকে, কামকলুষ মাথা তুলিতে পারে না! দ্বিতীয়—স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর স্নেহময়ীমূর্ত্তি—সকল রমণীর উপর উপস্থাপিত করা। পিতা জন্মদাতা এবং মাতা গর্ভধারিণী ও প্রসব-কারিণী। যাঁহাদিগের কৃপায় আমরা এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরায় অবতীর্ণ হইয়া হস্তপদাদিযুক্ত ও কমণীয় কান্তিবিশিষ্ট মনুষ্য জীবন লাভে জাগতিক বস্তুনিচয় উপভোগ দ্বারা আপনাদের ধন্য জ্ঞান করিতেছি, সেই জনক জননীর প্রতি আমাদিগের কতটুকু শ্রদ্ধাঞ্জলি ও ভক্তি অর্পণ করা কর্ত্তব্য? এই শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানসঙ্কেতেই কি শাস্ত্র বলেন না—"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা"?

স্ত্রীজাতি প্রসব বা সৃষ্টিকারিণী এবং তাহারা জননীর অনুরূপা স্নেহ-মমতার প্রতীক—মাতৃজাতি:— এই ভাবটী হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া স্বীয় মাতৃমূর্ত্তি সকল রমণীতে আরোপ করিলেই, কামভাব দূরীভূত হইয়া তৎস্থানে মাতৃভাবের উন্মেষ হইবে। সাধারণের ইহাই আচরণীয়। সকল রমণীকে স্বীয় জননীর অনুরূপা চিন্তনই কামরিপু দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে, ইহা ছাড়া আর একটি উপায় আছে—যাহাতে স্ত্রী-পুরুষ

ভেদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবেক এবং বিচার দ্বারা মহাপুরুষগণের উক্তি ও শাস্ত্রবাক্য অনুশীলনে যখন জ্ঞান হইবে যে—এক হইতে সকলের উৎপত্তি, একেই সকলের পরিসমাপ্তি এবং এক ব্রহ্মের অভিন্ন মূর্ত্তি অর্দ্ধনারীশ্বর হইতেই স্ত্রী-পুরুষগণের উদ্ভব ও তাহা মায়িক ক্ষেত্রের অভিধান মাত্র; তখনই স্ত্রী পুরুষ ভেদভাব নিরাকৃত হয় এবং উভয়ের অন্তঃশায়িত অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞানে অভিন্নবুদ্ধি প্রবাহিত হয়। লোকনায়ক ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অভেদবুদ্ধি —পরমার্থ ক্ষেত্রে এবং আরাধ্যা শ্রীশ্রীভবতারিণীর চিরজাগরুক প্রতিমূর্ত্তি ব্যবহারিক জগতে উদিত ছিল বলিয়াই, সর্ব্ব রমণীকে তিনি পুরুষ হইতে অভেদ দৃষ্টি বা মাতৃভাবে নিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে রওনা হইয়া কলিকাতাস্থ মেছুয়াবাজারের রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সাজিয়া গুছিয়া—মাথায় খোঁপা বাঁধিয়া ও কপালে টিপ পরিয়া কতকগুলি বারবিলাসিনী একটি দ্বিতল গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে এবং মোহিনীবেশে বাঁধা হুকায় তামাক খাইতে খাইতে পথগামী লোকের মন

ভুলাইতেছে। বালকস্বভাব সদানন্দময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাদিগকে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"মা! তুই এখানে এই ভাবে রয়েছিস্? তোকে এই রূপেই আমি প্রণাম করি।"—অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন শ্রীশ্রীজগদম্বা বারনারী রূপেও সেখানে বিরাজ করিতেছেন। আহা! ধন্য সেই দর্শন ও অনুভূতি! অতএব এইরূপ—

(৩) কামগন্ধরহিতং।—কামলেশশূন্য ইত্যাদি। কাম অর্থে বাসনা অথবা ষড়রিপুর অন্তর্গত প্রথম রিপু। প্রথমার্থ পাই আমরা শ্রীভগবানের উক্তিতে গীতায়, যেখানে তিনি বলিতেছেন—"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ" ইত্যাদি। এখানে "কামাশ্রিত্য দুষ্পূরং" অর্থে দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন করিয়া এবং পরোক্তার্থের আভাষ দিয়াছেন যথা—

> "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥"
>
> —১৬ শঃ অঃ ২১।

—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ; ইহা নীচযোনিপ্রাপক আত্মনাশের

মূল, অতএব এই তিনটি অবশ্য পরিহার্য্য। বস্তুতঃ কাম অর্থেই কামনা, অথবা কামনারূপ তরঙ্গেই কামের (অসৎ প্রবৃত্তি দ্বারা অসদ্ ভোগের) উদ্ভব হইয়া থাকে। ক্রোধ হিংসাদির আশ্রয়ে শারীরাভ্যন্তরে যেরূপ একপ্রকার প্রাণনাশক বিষাক্ত বীজাণুর উদ্ভব হইয়া থাকে, কামের আশ্রয়েও সেইরূপ এক প্রকার কামবীজ দেহমধ্যে ক্রীয়াশীল হয়। তবে এই বীজ প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। ইহারা সুপ্তাবস্থায় রক্তের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। যখনই লোভনীয় কোন বস্তু দর্শন বা তাহার স্মৃতি মনে জাগরিত হয়, তখনই একটি ইচ্ছার তাড়িৎ প্রবাহ শরীরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়, ও তৎসঙ্গে সুপ্ত কাম-বীজগুলি জাগরিত এবং ক্রীয়াশীল হইয়া পুরুষের ইচ্ছানুরূপ ফল দিতে উন্মুখ হয়; সুতরাং এই ক্রিয়াশীল অবস্থাই হইতেছে কামের জাগরণ এবং এই জাগরণ দিবার শক্তি একমাত্র বাসনা বা মনেরই আছে। কামের বৈজ্ঞানিক যুক্তির সমর্থনসূচক বাণীও পাই আমরা 'নারদভক্তি সূত্রে'। ভক্তি সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তরঙ্গায়িতাপীমে সঙ্গাৎসমুদ্রায়ন্তি।" ৪৫। — অর্থাৎ কাম ইত্যাদির 'তরঙ্গ'—সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই তরঙ্গ দুঃসঙ্গের বাতাস পাইলেই সমুদ্রের আকার ধারণ করে, এই জন্য তিনি "দুঃসঙ্গ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ।" —এই কথা বলিয়াছেন। কামের পশ্চাতে এই যে মনের লুকোচুরি, ইহা ধরা বড় কঠিন; কারণ 'দুঃ' বা 'সুসঙ্গ' উভয়ই মনের নিয়ন্তৃত্বে মনোনীত হয় এবং মনের বিকৃতাঙ্গ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনাই সেখানে যন্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব মনকে দমন অর্থাৎ তৎবৃত্তির নিরোধ সাধন করিতে পারিলেই কাম দমন সম্ভব হইবে।

পূর্ব্বপূর্ব্বাচার্য্যগণ উক্ত কাম রিপুকে দমন করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন—'ব্রহ্মচর্য্যব্রত' প্রবর্ত্তন করিয়া। সেই জন্য পূর্ব্বকালে চতুরাশ্রমের * মধ্যে আদি আশ্রমই ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এক্ষণে

* চতুরাশ্রম বলিতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাসকে বোঝায়। শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি অপর তিন বর্ণের প্রত্যেক পুরুষেরই জীবনকাল চারিভাগে বিভক্ত ছিল; যথা (১) নবমবর্ষে উপনয়নের পর হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে

'ব্রহ্মচর্য্য' বলিতে আমরা বুঝি কি?—না বীর্য্যধারণ। বীর্য্যই সকল বস্তুর সার; কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন—

"সম্যক্ পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতোরসঃ।
রসাদ্‌রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে॥
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"

—অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে তাহার সারকে রস কহে। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। সেই জন্যই শিব-সংহিতাকার বলিয়াছেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।"

এবং এই নিমিত্ত শাস্ত্র বার বার 'ঊর্দ্ধরেতা' হইবার আদেশ দিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বলেন—

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥"

থাকিয়া শাস্ত্রপাঠাদি ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হওয়া (২) ২৫ বৎসর হইতে ৫০ পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবন বা গার্হস্থ্য (৩) ৫০এর পর হইতে বানপ্রস্থ (৪) ও তৎপরে সন্ন্যাস।

—অর্থাৎ বিদ্বদ্বৃন্দ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা ; এবং যিনি উর্দ্ধরেতা, তিনি মানুষ নহেন—দেবতা। বাস্তবিক ইহা সত্য ; কারণ ঐ কামই যোগীগণ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া মূলাধারাদি ষটচক্রভেদপূর্ব্বক সহস্রদল সহস্রার-কমলে উঠিয়া ব্রহ্মানুভূতি প্রদান করে এবং এইজন্য ইহাকে যৌগিক আখ্যায় 'কুণ্ডলিনী' শক্তি বলা হয়। এই কুণ্ডলিনীর আবাসস্থান মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্রের মধ্যক্ষেত্র—লিঙ্গের উৎপত্তিস্থলে। উহা বলয় সদৃশ লিঙ্গমূলকে সার্দ্ধত্রিবেষ্ঠনি দ্বারা বিদ্যমান, এই নিমিত্ত যোগশাস্ত্রকারগণ—উহাকে 'স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টিনী' বলিয়া অভিহিতা করেন। ঐ স্থানে অত্যুষ্ণ অপান বায়ুর গতি ও সীমানা বলিয়া উহাকে অগ্ন্যাধারও বলা হইয়া থাকে। যোগী ঐ অগ্ন্যাধারস্থিতা সুপ্তা কাম বা কুণ্ডলিনীশক্তিকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ও প্রাণায়ামরূপ হবনে প্রাণবায়ুর আহুতিতে যখন প্রাণাপান সংযোগে সুষুম্না-মৃণালদণ্ড মধ্যগত সূক্ষ্ম পথ দিয়া চক্রগুলিকে পর পর ভেদ করিয়া সহস্রারে উত্থিত করিতে পারেন, তখনই ঐ কামস্থলে প্রেম বা আনন্দ—যাহা ব্রহ্মেরই অভিন্নবাচক, তাহার আস্বাদান বা অনুভূতি লাভ দ্বারা

তিনি ধন্য হইয়া থাকেন। ঐ কাম বা কুণ্ডলিনীশক্তি আঁকিয়া বাঁকিয়া ভুজঙ্গাকৃতিতে অগ্রসর হয় বলিয়া উহাকে 'সর্প' নামে অভিহিত করা হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে—কামের সুনিয়ন্ত্রণ বা ব্রহ্মচর্য্যই নরনারীমাত্রের করণীয় বা আশ্রয়ণীয়। —কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মানুষ তাহা বুঝে না। তাহারা চায় রূপ এবং ভোগের পূজা করিতে। স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের মন বিকৃত হয় এবং সকলকে আপন করিতে প্রধাবিত হয়; কিন্তু তাহাদের বঝা উচিত যে—যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের মন বহির্ব্বিষয়ে ছুটিয়া বেড়াইতে চায়, সেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি কোথায় এবং স্থায়িত্বই বা তাহার কতক্ষণ! বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—যাবতীয় রঙ্ এক সূর্য্যরশ্মির কম্পন-তারতম্যেই উৎপত্তি হয়, যথা ৪০০ শত বিলিয়ান (১০ লক্ষ বার) কম্পনে লাল রঙ, ৭৫০ শত বিলিয়ান কম্পনে বেগুনে রঙ;—এইরূপ কম্পনের তারতম্য হইতেই সপ্ত রঙের উৎপত্তি, এবং উক্ত সপ্ত রঙের সংমিশ্রনেই সাদা রঙের বিকাশ; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—প্রত্যেক বস্তুর রঙ, এমন কি মানুষের গায়ের রঙও ঐ সূর্য্যরশ্মির কম্পন হইতে

উৎপন্ন হয়। সূর্য্যই হইল তাহা হইলে রঙ উৎপত্তির মূল বা কারণ; অতএব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী অবশ্যই কার্য্য দেখিয়া কারণে মনোনিবেশ করিবেন, অথবা কারণ দেখিয়া কার্য্যে মোহিত হইবেন না। শাস্ত্র ঠিক এই কথা না বলিলেও অন্যরূপ আভাস প্রদানে বলিয়াছেন—

"ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্‌কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি॥
—যোগবাশিষ্ঠ। বৈরাগ্য৹

—অর্থাৎ [কোন রমণীর] চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও বারি পৃথক করিয়া যদি কোন প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে তাহা দর্শন কর, অন্যথা মিথ্যা মোহিত হও কেন? বিচার দ্বারা মনকে বাহির হইতে টানিয়া আনিয়া সর্ব্বদা আত্মস্থ করনই প্রলোভনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। এই উপায় সম্বন্ধে বহু মনীষী বহু প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—(১) কুচিন্তা বা কামের উদয় হইলে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ধ্যান করিবে (২) সদ্‌গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ ও বিচার করিবে (৩) কটু, অম্ল, উষ্ণ, লবণাক্ত ও উত্তেজক আহার সর্ব্বথা ত্যাগ

করিবে (৪) স্ত্রী মাত্রেই মাতৃবুদ্ধি আনয়ন করিবে (৫) বেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক সকল প্রাণীতে অদ্বিতীয় সত্তা—আত্মার ভাবনা করিবে ইত্যাদি। তবে শেষোক্ত পন্থা একমাত্র জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব; সাধারণের পক্ষে অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে নারীতে মাতৃবুদ্ধি এবং নারীর পক্ষে পুরুষের প্রতি শিব বুদ্ধি স্থাপনই কাম দমনের অত্যুৎকৃষ্ট পন্থা এবং ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপদেশ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ইহার মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাহার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কি বেদান্তোক্ত—কি তন্ত্রোক্তমার্গ, সকলই তাঁহার অধিগত ছিল, এবং সেইজন্য তিনি "সর্ব্বজীবে ব্রহ্ম হেরি" অথবা সর্ব্বরমণীতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ বিজিতেন্দ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। কাম তাঁহার নিকট সংকাম বা প্রেমরূপে পরিণত হইয়াছিল, 'আমিত্ব'টুকু কাটাইয়া বিশ্বের মধ্যে তিনি আপন সত্তা বিলাইয়া দিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহাকে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি। সাধারণ মানুষ বাসনার অঙ্কুশাঘাতে জর্জ্জরিত এবং পরাধীন প্রায়, এই নিমিত্ত সে—পথ চলিবার সহায়স্বরূপ কোন কিছুর অবলম্বনের

প্রত্যাশা করে এবং প্রাপ্ত হইলে হতাশ না হইয়া বরং আশ্বস্ত হয়। বাসনার দাস আমরা বাসনামুক্ত মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই অগ্রসর হই এবং ইহাই জগতের নিয়ম। সুতরাং আধুনিক যুগকর্ণধার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যোতির্ম্ময়—প্রেমঘন আদর্শই আমাদের অবলম্বনীয়। শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব এই নিমিত্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে নয়,—উদারতার আলোকচ্ছটা দেখাইয়া বলিয়াছেন—"যিনি আপনার সর্ব্বগুণভূষিতা পত্নী ও ভোগসুখেরতা বহু যুবতীগণকে কামচক্ষে দর্শনের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতীক স্বরূপে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পূজা করিয়া শক্তিকে চির সম্মানার্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বালক স্বভাব—নির্ব্বিকারচিত্ত যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর, তোমাদের কল্যাণ হইবে এবং কামজিৎ হইয়া যথার্থ প্রেমের অধিকার লাভে ধন্য হইবে!"

ষষ্ঠ অধ্যায়

কামিনীকাঞ্চনের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় বলা হইতেছে—কাঞ্চন ও এমন কি কোন ধাতু এবং তন্নির্ম্মিত পদার্থও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্পর্শ করিতে পারিতেন না; স্পর্শ মাত্রে তাঁহার হস্তাঙ্গুলি বিকৃত হইয়া যাইত। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, তদ্ব্যতীত সকলই অবস্তু বা মিথ্যা,—সুতরাং সদ্‌বস্তুর ভাণ্ডারী শ্রীশ্রীঠাকুর অসতের সংস্পর্শে আসিলেই সমাধিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবিয়া যাইতেন! শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এক্ষণে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অদ্ভুত চরিত্রটি অঙ্কন করিয়া 'লোকশিক্ষার্থং' জগৎকে দেখাইতেছেন, যথা :—

সংস্পৃশ্যধাতুনিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ,
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যো ভবেজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য,
স্তং ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। অহো যো ধাতুনিচয়ান্ (হেমাদীন্) সংস্পৃশ্য (ত্বগিন্দ্রিয়বিষয়ীকৃত্য) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) পরিকম্পিতাঙ্গঃ (কম্পযুক্তাখিলদেহঃ) বিকৃতাঙ্গুলিঃ (বক্রতাপন্নাঙ্গুলিঃ) সংজ্ঞাবিহীনঃ (নিষ্কলঃ) ইব (ঔপম্যে) জড়বৎ (কাষ্ঠাদিবৎ) ইন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যঃ (ইন্দ্রিয়ক্রিয়ারহিতঃ) চ ভবেৎ (সম্ভাবনায়াং লিঙ্) ত্যাগপারগং (বিষয়বিতৃষ্ণায়া পরাং কাষ্ঠামুপেতং) তং (প্রসিদ্ধং) রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্গুণশ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহ-প্রত্যয়ৈকতয়া সমুপাসস্ব)।

অর্থ। স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুস্পর্শে যাঁহার কলেবর কম্পিত ও অঙ্গুলিনিচয় বক্রতা প্রাপ্ত হইত, এবং স্পর্শমাত্রে যাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় বিলুপ্ত হইয়া সদা জড়বদ্‌প্রাপ্তে সমাধি সমাগত হইত,—যথার্থ বিষয়বিতৃষ্ণ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর, সর্ব্বপ্রলুব্ধকারিণী কাঞ্চনের বাসনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

দীপিকা। (১) **সংস্পৃশ্য ধাতুনিচয়ান্... বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।** —স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুনিচয়স্পর্শে যাঁহার অঙ্গ কম্পিত এবং হস্তাঙ্গুলিসমূহ বিকৃত হইয়া যাইত ইত্যাদি।—এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ধাতুনিচয়

স্পর্শ করিলে তাঁহার অঙ্গ কম্পিত ও অঙ্গুলিসকল বিকৃত হইত কেন? কোন বৈদ্যুতিকশক্তি ধাতুদ্রব্যে ত মিশ্রিত থাকিত না, তবে সাধারণ অবস্থায় এইরূপ বিকারসমূহের উপস্থিত হইবার কারণ কি ছিল? —এই প্রকার বহু প্রশ্ন পাঠকপাঠিকা মাত্রেরই হৃদয়ে উত্থিত হইতে পারে। তবে ইহার মীমাংসা করাও বড় কঠিন কার্য্য নয়; কারণ ইহা সত্য যে— আত্মান্বেষী সাধক যখন বেদান্তোক্ত 'নেতি নেতি' —'ইহা নয় ইহা নয়' করিতে করিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তা আত্মারই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হন, তখন তাঁহার ধারণা হয়—'একমাত্র আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই জগতে।' শ্রুতি বলিয়াছেন —"ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি,—সুতরাং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনশীল যতচিত্ত সাধক—ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুকেই যে অনিত্য জ্ঞান করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে যদিও ইহা সত্য যে—এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে—তদতিরিক্তের প্রশ্ন আর মানব-মনে জাগিতে পারে না, তত্রাচ ইহাও নিশ্চিত

যে, যতক্ষণ না একাকারাবৃত্তির উদয়ে সমাধিতলে অদ্বিতীয় জ্ঞানের অনুভূতি আসিতেছে মানুষে, ততক্ষণ ব্যবহারিক জগতে দ্বৈতের ভাণে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে হইবে এবং ততক্ষণই জীব—ঈশ্বর, মানুষ—দেবতা, আত্মা—অনাত্মা, সত্য—মিথ্যা, প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম ইত্যাদি ভেদ বা দ্বৈত জ্ঞান মধ্যে তাহাকে থাকিতে হইবে!

দ্বৈতক্ষেত্রে থাকিয়া অদ্বৈতের ভান চলিতেই পারে না; সে'জন্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেও দেখা যায় যে—তিনি যতক্ষণ গভীর সমাধিতে বাহ্যজগতের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মানন্দসাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন, ততক্ষণ আর দ্বৈতবাচক আত্মা-অনাত্মার প্রবাহ তাঁহার মধ্যে থাকিত না; কিন্তু যখনই সমাধিভূমি হইতে তাঁহার মন বহির্ম্মুখী হইয়া ব্যবহারিক জগতে নামিয়া আসিত, তখনই তিনি লোকশিক্ষাহেতু আত্মানাত্ম বিচার করিয়া ভক্তবৃন্দ ও জগতকে উপদেশদানে দ্বৈতক্ষেত্র বা জগতের আইন মানিয়া চলিতেন। তিনি বলিতেন—"কামিনীকাঞ্চনই মানুষকে বদ্ধ করে। 'আমার ভাল স্ত্রী হউক, আমার অনেক টাকা হউক"—এই সব অনিত্য বুদ্ধি এনো না,

সর্ব্বদা ভাব তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আত্মা, তোমাকে কেহ বন্ধন করিতে পারে না, কেহ মায়ায় মুগ্ধ করিতে পারে না”—ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যবহারিক জগতই যাঁহার নিকট অনিত্য বলিয়া তুচ্ছ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাঁহার নিকট ব্যবহারিক জগতের বস্তুনিচয় অর্থাৎ যাহা লইয়া জগৎ, সেই উপকরণগুলি যথা—মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র—টাকাকড়িও যে অনিত্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ‘নেতি নেতি’ বিচারদ্বারা তিনি এইগুলিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই অনিত্য স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুনিচয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়াই উপেক্ষিত হইত?

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, ধাতুনিচয় না হয় তাঁহার বিচারবুদ্ধির নিকট উপেক্ষিত হইল, কিন্তু তাহাদের স্পর্শমাত্রই যে শরীরে বিকারসমূহ উপস্থিত হইবে, ইহারই বা কারণ কি? ইহা কি তাঁহার অত্যধিক ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক ছিল না? উত্তর—না; যদ্যপি আমরা স্থির মস্তিষ্কে একবার চিন্তা করিয়া দেখি—দেখিব, স্বর্ণ—রৌপ্য ও তাম্রাদি ধাতুই সামাজিক পরিভাষায় ‘কাঞ্চন’ বলিয়া কথিত, অথবা ইহাদিগকে

'সম্পদ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ ঐসমস্ত মূল্যবান ধাতুপদার্থ যাঁহার গৃহে যত অধিক পরিমাণে থাকে, তিনিই সমাজে তত অধিক ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে—ধাতু মানুষকে কেবল ধন, মান, যশ ও ভোগসুখই প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার মোহেই মানুষ আত্মবিস্মৃত জীবে পরিণত হইয়া কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস হয় ও সংসাররূপ ভোগের অপভ্রংশ রোগভূমিতে যাতায়াত করিয়া পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণার নিষ্পেষণযন্ত্রে এবং মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতে থাকে। অতএব যে ধাতু বা ধন জন্ম-মৃত্যুবিভীষিকার কারণ হইয়া মানুষকে পদে পদে দুঃখের অনলে দগ্ধ করিতে থাকে, সে 'কারণ' চিরশান্তিকামী বালকস্বভাব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে হৃৎকম্প উপস্থিত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি থাকিতে পারে? তিনি ধাতুজাত অর্থকে সর্ব্বদুঃখের মূল জানিয়া তৎপ্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মন অজ্ঞাতসারেও আর অর্থাদির দিকে ধাবিত হইত না এবং মন সংযত হওয়ায় তচ্চালিত শারীরিক যন্ত্র হস্তাদিও তাহা হইতে চিরদিনের জন্য বিরত হইয়াছিল।—কাজেই কাঞ্চনের

বীজস্বরূপ ধাতুদ্রব্যকে তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না এবং কোনরূপে হস্তাদি অঙ্গের সহিত পৃষ্ট হইলেও তাহা স্বভাববশতঃ কম্পিত এবং বিকৃত হইয়া যাইত, অভ্যস্ত সত্য-সংস্কার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দিত না। তৎপরে—

(২) **সংজ্ঞাবিহীন ইব যো সদ্যো ভবেজ্জড়-বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যঃ।**—অর্থাৎ যিনি ধাতুদ্রব্যস্পর্শনে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, জড়ের তুল্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল অতিক্রম করিয়া গভীর সমাধিতলে নিমগ্ন হইতেন। * * প্রথমতঃ দেখা যাউক 'ইন্দ্রিয়বৃত্তি' বলিতে আমরা কি বুঝি, তৎপরে তাহা কিরূপে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া নিষ্ক্রিয় ও জড়বৎ অবস্থায় পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

'ইন্দ্রিয়' বলিতে বুঝি আমরা জ্ঞানসাধন-করণ বা যন্ত্রবিশেষ;—অর্থাৎ যদ্দ্বারা সমুদয় পদার্থের জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই ইন্দ্রিয় বলে। ইন্দ্রিয় মোট চতুর্দ্দশটি এবং তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত;—যথা (১) চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (২) বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়

এবং (৩) মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে—এই সকল ইন্দ্রিয় কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হইল? বেদান্ত বলেন তমোগুণাধিক বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য (অবিদ্যা) হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই প্রথমোৎপন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থই সূক্ষ্মভূত নামে কথিত। সূক্ষ্মভূতপঞ্চ স্বীয় কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের তুল্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক। তৎপরে উক্ত পঞ্চ-ভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে "অন্তঃকরণ" এবং উহার প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজঃ অংশ হইতে বাক্-পাণি আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। উপর্যুক্ত অন্তঃকরণ আবার বৃত্তিভেদে চারিপ্রকার আকারে প্রকাশিত হয়; যথা-

অন্তঃকরণ

(১) বুদ্ধি (২) মন (৩) চিত্ত (৪) অহঙ্কার

তন্মধ্যে (১) বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়করণশক্তিযুক্ত চিত্তবৃ

(২) মন ,, সঙ্কল্প-বিকল্পযুক্ত বৃত্তি।
(৩) চিত্ত ,, অনুসন্ধানাত্মক আত্মবৃত্তি।
(৪) অহঙ্কার ,, অভিমানাত্মক আত্মবৃত্তি।

তবে চিত্ত, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার মনেরই অন্তর্গত; কারণ বুদ্ধি হইতেই অনুসন্ধানবৃত্তি ও মন হইতেই অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় পরস্পর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেও, আমরা দেখিতে পাই তৎপশ্চাতে এক অনন্ত শক্তি নিশ্চয়ই আত্মগোপন করিয়া আছেন এবং সেই শক্তির অস্তিত্বে সকলেই অস্তিত্ববান বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বস্তুতঃ কিন্তু, ইন্দ্রিয়সকল করণ বা যন্ত্রস্বরূপ এবং জড়, ইহাদের নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, ইহাদের পশ্চাতে অবস্থিত চৈতন্যের দ্বারাই ইহারা ক্রিয়াশীল হইয়া প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং এই চৈতন্যই যে সকলের মূল কারণ, ইহার অবতারণায় কেন শ্রুতি প্রথমেই প্রশ্নচ্ছলে বলিয়াছেন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥"

—অর্থাৎ মন কাহার ইচ্ছাবশে স্ববিষয়ে প্রেরিত হইয়া গমন করিতেছে? শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা কাহার প্রেরণায় গমনাগমন করিতেছে? লোকসকল কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বাক্য উৎপন্ন করিতেছে? ইত্যাদি। তদুত্তরে ইহাদের প্রেরয়িতাকে পুনঃ নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন :—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

—কেনোপনিষৎ ১।৬

—অর্থাৎ লোকে যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু শক্তিবিশিষ্ট হইয়া বিষয় সকল দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি 'ব্রহ্ম' বলিয়া জান; কিন্তু সাধারণ লোকে যে বিভিন্নরূপবিশিষ্ট জড় বস্তুকে ব্রহ্ম ভ্রমে উপাসনা করে, তাহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে। এইরূপে "যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি—" "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি" বাক্য দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মকেই—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্,
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" (কেন ১।২)

—বলা হইয়াছে; এবং ইহার দ্বারা প্রমাণও হইতেছে যে—জড় ইন্দ্রিয় করণ মাত্র, কারণ নহে।

এক্ষণে আত্মান্বেষী মহাত্মাগণের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি—তাঁহারা শম-দমাদি ষট্‌সম্পত্তি সহায়ে ও বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন—ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগসুখে বিগতস্পৃহ হইয়া আত্মবস্তু লাভ করিতে যত্নবান হন, বহির্জ্জগতের বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া তাঁহারা হৃদয়াকাশস্থিত (দহরাকাশে) অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ *—আত্মায় নিবদ্ধ করেন, বাহিরের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু তাঁহাদিগের নিকট তুচ্ছজ্ঞান হইয়া যায়; কারণ তাঁহারা বিশেষভাবেই জানেন যে—

---

* উপনিষদ্‌কারও বলিয়াছেন—

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

(কঠ ৩।২।১৭).

—অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ, প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন, "অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।" [কঠ ২।১।১২]

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥"

(কঠ।১।৩।১০)

—অর্থাৎ শ্রোত্র-ত্বকাদি ও পাদ-পায়ু-উপস্থাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গণ হইতে অর্থ অর্থাৎ—স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্য বিষয় সমূহ শ্রেষ্ঠ, অর্থ হইতে মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই আত্মাই দহরাকাশস্থিত পুরুষ এবং 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।'—অর্থাৎ পুরুষই জীবের সর্ব্বোত্তমা গতি। আত্মান্বেষী তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই মগ্ন হইয়া যান, তৎপরে—'যং গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'—বাহিরের সংবাদ আর লইতে পারেন না।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনেও ঠিক তদনুরূপ ঘটনা উপস্থিত হইত। অনিত্য ভোগ-সুখদায়ী কাঞ্চনেরই অভিন্ন মূর্ত্তি ধাতুদ্রব্যস্পর্শে, তাঁহার মন-অনিত্যকে ত্যাগ করিয়া একেবারে নিত্যের দিকে ছুটিয়া যাইত এবং বাহ্য ছাড়িয়া অন্তরে নিবিষ্ট হওয়ায় —বাহ্যচেষ্টাদি তাঁহার এককালে লোপ পাইয়া যাইত ও গভীর সমাধিতে স্থির—ধীর ও নিষ্কম্প প্রদীপের

তুল্য তিনি অবস্থান করিতেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥"

[৬ অঃ ১৯]

—অর্থাৎ নির্ব্বাতদেশে দীপ যেরূপ বিচলিত হয় না, প্রযতচিত্ত আত্মসমাধিপর যোগীর চিত্তের সেই সমাহিতাবস্থার উপমাও শাস্ত্রে সেরূপ স্মৃত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্যেরই একমাত্র সাধক ছিলেন বলিয়া, অনিত্য ধাতুদ্রব্যাদি স্পর্শ করিলে—'ধাতুই সংসার বন্ধনের হেতু, মানবকে তাহার পারে যাইয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে'—এই চিন্তা বিদ্যুৎবেগে তাঁহার মনকে স্পর্শ করিবামাত্র 'অনিত্য' ছাড়িয়া নিত্যব্রহ্মে তিনি ডুবিয়া যাইতেন। সকলই ছিল তাঁহার অদ্ভুত; এই জন্য শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বিস্ময়ে বলিয়াছেন—

(৩) অহো!—বাস্তবিক ইহা আশ্চর্য্যই বটে! অর্থাৎ—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে যতই আমরা আলোচনা করিব, ততই দেখিব

—কি অমানুষিকই না ছিল তাঁহার চরিত্র ! যে নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিতে যোগিগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া তপস্যাচরণ করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন, অথবা একবার যাহা অধিগত হইলে জীব 'অতিমৃত্যু' অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়, সেই দুর্লভ সমাধি তিনি মাত্র তিন দিনে লাভ করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ! শুধু তাহাই নহে, যখন তখন অনায়াসে সেই নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করিয়া তিনি ব্রহ্মানন্দসাগরে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন ! তৎপরে, যে নির্ব্বিকল্পভূমিতে উপস্থিত হইলে ভাগ্যবান যোগীকে আর কখনও বহির্জ্জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, একুশদিন মাত্র শরীর থাকিয়া শুষ্কপত্রের ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়া যায়, সেই সমাধি লাভ করিয়া অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, জীবহিতকল্পে—অনায়াসে বাহ্যজগতে নামিয়া আসিয়া দ্বৈতের সুরে সুর মিলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কি অদ্ভুতই না ছিল তাঁহার জীবন !

একবার দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতলে সন্তান ও ভক্তগণ ধরিয়া বসিলেন যে—নির্ব্বিকল্প সমাধি ও তৎপূর্ব্বে কোন্ কোন্ অনুভূতি সকল হৃদয়ে সমুপস্থিত হয়,

তাহা একে একে বিবৃত করিতে হইবে। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের মত হাসিয়া তৎসম্বন্ধে বলিতে সম্মত হইলেন এবং গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। সহস্রার-কমলে মন উঠিবার কালে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহতক্রমে এক একটি পদ্মের অনুভূতিসমূহ প্রকাশ করিয়া তিনি আজ্ঞা-চক্রের রহস্যও অতিকষ্টে বর্ণন করিলেন, কিন্তু আজ্ঞাচক্র হইতে যখনই তাঁহার সংস্কৃত মন সহস্রার পদ্মের দিকে ছুটিয়া চলিল, তখনই তিনি আপনাতে আপনি মিশিয়া স্থির—ধীর ও নিষ্কম্প হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, অনুভূতির কথা তখন আর কে কাহাকে বলিবে? নীরবে মুহূর্ত্তকাল কাটিল, আবার মন আজ্ঞায় নামিল, তিনি সহস্রারের অনুভূতি সকল বলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় মনকে তদভিমুখে ধাবিত করিলেন, কিন্তু আবার সেই অবস্থা, স্থির—ধীর ও নিষ্কম্প! বহুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিভূমি হইতে নামিলেন এবং বালকের মত লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'কি করব বাবু! আমি ত বল্‌তে চেষ্টা করি, কিন্তু কে যেন মুখকে চেপে ধরে, বল্‌তে দেয় না।' এক্ষণে ভাবুন পাঠকপাঠিকা! বহু

যুগার্জ্জিত সমাধি তাঁহার নিকট কত সহজ—কত অনায়াস লভ্য ছিল! সমস্তই বিস্ময়কর!! তৎপরে পুনরায় বলা হইয়াছে—

(৪) ত্যাগপারগং।—ত্যাগীরও তিনি পরাকাষ্ঠা ছিলেন। কাঞ্চন মুক্তিপথের অন্তরায় জানিয়া—তাহা স্পর্শই করিতে পারিতেন না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। একবার জনৈক ধনী মাড়োয়ারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবার জন্য কয়েক হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং বালকের মত ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। স্বার্থপরের দান যে স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্য হইতে একবিন্দুও বিচ্যুত নয় এবং উহা মানুষকে দিতে পারে মাত্র ধন, জন, বাড়ী, মান ও মর্য্যাদা,—সচ্চিদানন্দ দান করিয়া অমৃতের অধিকারী করিতে পারে না, ইহাই ছিল তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, এবং এইজন্য স্বার্থান্বেষী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক যতক্ষণ না টাকা লইয়া তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি সুস্থির হইতে পারেন নাই। উত্তরকালে এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন—'মাড়োয়ারীর টাকার কথা শুনে মন

হল, কে যেন আমার মাথায় করাত বসিয়ে দিল ইত্যাদি।'

ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে—সাধনকালে যখন তিনি বিচার দ্বারা কাঞ্চনের অনিত্যতা চিন্তা করিতেন, তখন সত্যই তৎপ্রতি তাঁহার কাকবিষ্ঠাতুল্য তুচ্ছ-জ্ঞান আসিল কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য জাহ্নবীকূলে বসিয়া এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মৃত্তিকা গ্রহণে —'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে বালকের মত অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন ; এতটুকু আসক্তি বা লোভও হৃদয়ের মাঝে তাঁহার উদিত হইত না। কি অদ্ভুতই না ছিল তাঁহার সাধনা! কত যুগে কত মহাত্মা ও অবতারপুরুষগণ ত চলিয়া গিয়াছেন, অলৌকিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত এত কঠোর সাধনা বা অদ্ভুত লীলা কেহ করিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চলন, বলন—সাধন সকলই ছিল যেন অত্যদ্ভুত, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব আমরা—তিনি ছিলেন পাগল? জানি না তাঁহার 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' সাধনের অন্তরালে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত ছিল, তবে শাস্ত্র আমাদের চিরদিন

বলিয়াছেন ও বলিতেছেন যে—জগতের সমুদয় পদার্থই ক্ষিত্যপতেজাদি পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন। আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানও তাহার অকাট্য যুক্তি ও চাক্ষুষ প্রমাণে আমাদের দেখাইতেছেন যে,—সোনা, রূপা ও সকল মূল্যবান ধাতুই রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, মৃত্তিকাই উহাদের আসল উপাদান। তৎপরে বহুমূল্য মুক্তাদির জন্মরহস্য সম্বন্ধেও যদ্যপি আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি—দেখিব, উহাও মৃত্তিকার বিভিন্ন বিকাশ বালুকা-কণা ও শুক্তির দেহাভ্যন্তরস্থ একপ্রকার রসের সংমিশ্রণেই উৎপন্ন; বালুকাকণাই হইল উহাদের উৎপত্তির প্রধান কারণ! জানি না—দূরদর্শী ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীশ্রীঠাকুর সেই নিমিত্ত কি মানুষের চক্ষু ফুটাইবার জন্য তাহাদের বিচারবান হইতে শিক্ষা দিয়াছেন এই সাধনার ইঙ্গিতে? 'মাটি হইতে আসে মাটিতে মিশায়'—এই সত্যের উপলব্ধি দ্বারা অনিত্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তুতে লক্ষ্য স্থাপনের জন্যই কি যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নূতন 'টাকা মাটি—মাটি টাকা'র সাধন-প্রক্রিয়া জগতের বক্ষে আচরণ করিয়া গিয়াছেন লোকশিক্ষার জন্য?

উক্ত সাধনের পর হইতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব টাকা —কাঞ্চন কেন, কোন ধাতুদ্রব্যই স্পর্শ করিতে পারিতেন না; সে'নিমিত্ত শ্রীশ্রীসারদাদেবী তাঁহার আহারের জন্য সব প্রস্তরের থাল ও গ্লাস ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। * * * একবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী, অজ্ঞাতসারে ধাতুস্পর্শেও তাঁহার অঙ্গবিকৃত হয় কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য বিছানার নীচে একটি টাকা লুকাইয়া রাখেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা জানিতেন না, তিনি শয্যাপরি বসিতে যাইলে অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—'দ্যাখ্ তো রে! বিছানার নীচে কোন কিছু ধাতুদ্রব্য আছে কিনা?' ভক্তেরা তাড়াতাড়ি বিছানা অনুসন্ধান করিয়া সত্যই তন্মধ্যে একটি টাকা লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন এবং অদ্ভুত ঠাকুরের সেই অদ্ভুতলীলা দর্শন করিয়া তাঁহারা বিস্ময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন।

সহৃদয় পাঠকপাঠিকা! ত্যাগীশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগনিদর্শন আর কতই বা আপনাদের নিকট ধারণ করিব! রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রাণের সহিত

ভক্তি ও ভালবাসিতেন, এবং সে'জন্য তিনি 'বাবা' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। একদিন শ্রীযুক্ত মথুরামোহন তাঁহার 'বাবাকে' আদর করিয়া একখানি বহুমূল্যের কাশ্মিরী শাল প্রদান করিয়া গাত্রে পরিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। বালকস্বভাব শ্রীশ্রীঠাকুর সেই শালখানি শ্রীযুক্ত মথুরের নির্দ্দেশ মত গায়ে দিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে—উহাকে যত্ন করিয়া রাখিতে হইবে, ধূলা কাদায় যেন মলিন হইয়া না যায় ইত্যাদি। অনিত্য একটি শালে তাঁহার মমতা ও আসক্তি উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া—তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে শালখানি খুলিয়া ধূলাতে নিক্ষেপ করিলেন এবং পদদলিত করিতে করিতে তাহাতে থুথু দিতে লাগিলেন, একবারও তাহার বহুমূল্যের কথা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। আহা! তাই বলি, সামান্য অর্থলুব্ধ আমরা তাঁহার সেই অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব? যেই টাকার জন্য পাগল আমরা, সেই টাকাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হিসাবপত্র না করিয়া আঁচল খুলিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মথুরা-মোহন যখন সপরিবার তীর্থযাত্রা করেন, তখন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম তৎসঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মথুরামোহন সর্ব্বত্র পাল্কী করিয়াই তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতেন। বৃন্দাবনের পথে অসংখ্য গরীব দুঃখীদের দুঃখ-কষ্ট দর্শন করিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠেন এবং তাহাদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার ও শীতবস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক তুষ্ট করিতে আজ্ঞা করেন। শ্রীযুক্ত মথুর 'বাবার' কথা যে কেবল পালন করিয়াছিলেন—তাহা নহে, তিনি এবং তৎপত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী পাল্কীর পার্শ্বে বস্ত্র বন্ধন করিয়া তাহাতে শত শত টাকা স্তরে স্তরে সাজাইয়া দিয়াছিলেন—যাহাতে ইচ্ছামত দীনদরিদ্র প্রার্থিগণকে তিনি দান করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, বহু দুঃখীলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে রাজা-উজির ভাবিয়া পাল্কীর চতুর্দ্দিকে মলিন বদনে আসিয়া দাঁড়াইল, করুণাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন একেবারে অধীর ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, বস্ত্রাঞ্চল খুলিয়া এককালে সমস্ত টাকা ছড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে আনন্দে কুড়াইতে দেখিয়া বালকের মত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঐরূপ কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—যাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কার্য্য, ত্যাগ, তপস্যা, অমায়িকতা ও নিরহঙ্কারিতা—সমস্তই অমানুষিক রকমের ও অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে। এই আশ্চর্য্যময় লীলা-চেষ্টাদি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব পূর্ব্বোক্ত 'অহো' ও 'ত্যাগীপারগ' কথা দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ত্যাগমার্গবিস্মৃত নর-নারীকে ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া বলিয়াছেন—'ভজ রামকৃষ্ণং'—অর্থাৎ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবকে শিখায়'—এই মহাবাক্য সফলকরণদ্বারা বিপথগামী নরনারীর মনকে সনাতন প্রবাহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য! অতএব সাম্প্রদায়ীকতার বেষ্টনী ভেদ পূর্ব্বক যিনি আকাশের মত উদার ও অনন্ত হইয়া **'যত মত তত পথ'** বাণীর সপ্রেম আলিঙ্গনে এই বিশ্বজগৎকে বন্ধন করিয়া গিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শরণাপন্ন হওয়াই যুগকল্যাণকামী মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়

এক্ষনে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব মহান্ চরিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিঃস্বার্থ ও পরমপবিত্র ভালবাসা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া স্বার্থপর ও মলিনচিত্ত সংসারীদিগকে বলিতেছেন :—

প্রেম্নঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং,
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।
তৎ প্রাপ্তুমিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্দ্র চিত্তান্,
কুর্ব্বন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকৃষ্ণং॥ ৭॥

অন্বয়ঃ। ইহ (অস্মিন্ সংসারে) সুবোধৈঃ (বিশুদ্ধচিত্তৈঃ জ্ঞানিভিঃ) প্রেম্নঃ যৎ স্বরূপং (স্বভাবং) বিমলং (কামনাদিদোষবিহীনং) পবিত্রং (শুদ্ধিবিধায়কং) নিঃস্বার্থম্ (স্বার্থরহিতং) ইতি (এবং) অভিধয়া (সংজ্ঞয়া) কথিতং (আখ্যাতং) তদ্ যদি

প্রাপ্তুম্ (লব্ধুম্) ইচ্ছসি (বাঞ্ছসি) (তদা) আশ্রিত জনান্ (ভক্তান্) প্রণয়ার্দ্রচিত্তান্ (প্রেমাপ্লুত-হৃদয়ান্) কুর্ব্বন্তং (বিদধতং) রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্‌গুণ শ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহ-প্রত্যয়ৈকতানতয়া প্রার্থয়)।

অর্থ। সুধীজনেরা যে প্রেমকে বিমল, পবিত্র ও নিঃস্বার্থ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রেম যদ্যপি লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে যিনি আশ্রিত (নিজ ভক্তগণের শুষ্ক-হৃদয়ে স্বার্থহীন-অ...। প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়া আপ্লুত করিতেন, সেই প্রেমদাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সেই প্রেম প্রার্থনা কর (শান্তি পাইবে)।

দীপিকা। (১) **ইহ**।—এই সংসারে। * * হিন্দুশাস্ত্রে ইহলোক ও পরলোক নামে দুইটি লোকের উল্লেখ দেখা যায়। (ক) 'ইহ' বলিতে এই জগৎকে

(ক) চার্ব্বাক-মতাবলম্বিগণ কিন্তু পরলোক মানেন না। তাঁহাদের মতে জড়দেহটাই 'আত্মা' নামে অভিহিত, সুতরাং জড়দেহের ধ্বংস হইলে আত্মার অত্যন্তাভাববশতঃ দেহের

বুঝায়, অর্থাৎ ভোগলোলুপ নরনারীর ও জীব জন্তুর বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামক্ষেত্রই 'ইহ জগৎ' নামে কথিত এবং সংগ্রাম শেষে মৃত্যুর পরাবস্থায় অবস্থিতি-ভূমিই 'পরলোক' নামে অভিহিত।

পুরাণকারগণ এই ইহ ও পরলোকের (আমুষ্মিক ও পারত্রিকলোক) মধ্যে বেশ একটি মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—ইহজীবনই কর্ম্মভূমি ও পরজীবন কর্ম্মের ফলভোক্তা মাত্র। ইহলোকে সৎকর্ম্ম করিলে পরলোকে 'সুখ' এবং অসৎকর্ম্ম করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এইজন্য পরলোকের নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা—স্বর্গ ও নরক। দর্শনকারগণ বলেন—স্বর্গ ও নরক সুখ-দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। কৃতকর্ম্মের ফলই অদৃষ্ট-রূপে সেই সুখ ও দুঃখের নিয়ন্তা! ইহজগৎ—কর্ম্ম-ভূমিতে মানুষ বাসনাবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং যতটুকু বাসনা সে চরিতার্থ করিতে পারে, ততটুকুতেই সে আত্মনিয়োগ করে' সমস্ত জীবন এবং

পুনরাগমন অথবা মৃত্যু পূর্ব্বে অবস্থিতির আর কোন কারণই থাকে না।

তৎপরে কালের ধ্বংসকারী কবলে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পরলোকে যাত্রা করে। যাহা হউক, ইহজগতই যে পরজগতের ভাগ্যনিয়ন্তা, ইহা সকলেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব ইহক্ষেত্রই যখন তাহার কর্ম্মালোকসম্পাতে মুক্তি ও বন্ধনরূপ ফলের নিদান, তখন ইহজগৎ এরূপ সাধুভাবে অতিক্রম করিতে হইবে—যাহাতে তাহা পরজগতের বৈরী না হইয়া মিত্র বা সহায়কই হয়!

ইহলোকে 'সৎ ও অস নামে [illegible] বিদ্যমান। তন্মধ্যে সত্যপথই শ্রেয়ঃ এবং সৎপথ[illegible] বলম্বীদিগের কথাই মূল্যবান—এই সঙ্কেতে কথিত বিষয় যে সত্য ও নিঃসন্দেহ, ইহার অবতারণায় বলা হইয়াছে—

(২) **সুবোধৈঃ।**—অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত সাধুগণদ্বারা (কথিত)। * * এক্ষণে এই যে রহস্যময় জগতে গমনাগমন, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই এক মহান্ সত্য লুক্কায়িত আছে এবং তাহা জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ বা সৃষ্টির মধ্য দিয়া পুরুষার্থ লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে; যাঁহারা এই রহস্য অবগত হইয়াছেন ও তাহার সমাধান করিয়াছেন বা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই

যথার্থ "সুবোধ" বা জ্ঞানী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বেদান্ত বলেন—জ্ঞান এক এবং তাহা সর্ব্বজীব ও প্রাণীতে বিদ্যমান। তবে এই জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য আছে। ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন—এই জ্ঞান অজ্ঞাত অপর এক বিরাটজ্ঞানকে আদর্শ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া ফুটিতে থাকে, কিন্তু বিরাটজ্ঞানের সমকক্ষ হইতে পারে না ; তবে ক্রমবিকাশেই তাহাদের অতুলনানন্দ। (১)

অদ্বৈতবাদী কিন্তু তাহা মানেন না। তাঁহার মতে বিরাট ও অংশজ্ঞানকল্পনা দ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদেরই নামান্তর। জ্ঞান বা ব্রহ্মের অংশাংশী স্বীকার অসম্ভব, সুতরাং তিনি বিকাশ মানেন সেই পর্য্যন্ত—যে পর্য্যন্ত না পূর্ণবিকাশ সাধনে জীব কৃতকার্য্য হয়, এবং এই বক্তাব্যক্তের মধ্যাবস্থায় বিকাশের তারতম্য অনুসারে 'সাধু—অসাধু' বা 'সু, কু' উপাধি জীব প্রাপ্ত

---

(১) পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি Evolutionistদের মতও অনেকটা এইরূপ। ইঁহারাও অজ্ঞেয় এক অনন্তশক্তির ক্রমবিকাশ মানিয়া থাকেন। ইহাদের এই মতকে 'শক্তিবাদ' নামে অভিহিত করা হয়।

হয়; অর্থাৎ উন্নতি ও অবনতির পরিমাপকই মনুষ্যত্ব
বিকাশের তারতম্য! যিনি যতটুকু মায়াবরণ আত্ম-
জ্যোতির উপর হইতে সরাইয়া লইতে পারিয়াছেন,
তিনিই জগতে তত পরিমাণে উন্নত ও যিনি যত নিশ্চেষ্ট
হইয়া আবরণকেই মুক্তাবস্থা জ্ঞানে [illegible] [illegible] [illegible]র
পরিপোষণ করিতেছেন, তিনিই তত অবনত মনুষ্য
বলিয়া জগতে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তবে উদারদৃষ্টি
সম্পন্ন বেদান্ত কিন্তু কাহাকেও অবজ্ঞার চক্ষে [illegible]
করেন না; তাঁহার মতে যে কোন মনুষ্য প্রবল চেষ্টা
করিলেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা তাঁহার
মায়াবরণ অপসারিত করিয়া মুক্ত বা 'সুবোধ' হইতে
পারেন। তবে সুবোধ বা জ্ঞানিগণ আত্মোন্নতির
দ্বারা জীবনরহস্যের সমাধান সাধন করেন বলিয়া
সাধারণ মনুষ্যগণ হইতে তাঁহারা বড় ও পূজ্য।
শ্লোকে 'সুবোধৈঃ' এ শেষোক্ত প্রকার ভাবের
মর্য্যাদা রক্ষণে এবং জ্ঞানীব্যক্তিদিগের চিন্তা ও বাক্যই
সমধিক মূল্যবান ও প্রামাণ্য—এই অর্থে ব্যবহৃত
হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিতেছেন
—বিশুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক যিনি (যেমন
শ্রীরামকৃষ্ণদেব)—

(৩) **প্রেম্নঃ যৎ স্বরূপং**।—অর্থাৎ প্রেমস্বরূপ (বলিয়া অভিহিত ছিলেন) ইত্যাদি। এক্ষণে 'প্রেম' বলিতে আমরা বুঝি কি? না—নিঃস্বার্থ ভালবাসা; শরীরের সহিত শরীরের নহে, পরন্তু আত্মার সহিত আত্মার যে স্বার্থ-বলিদানে ও আত্মহারায় ভালবাসা, তাহাই 'প্রেম' নামে কথিত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ-সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥'

—অর্থাৎ স্বার্থের বা স্বীয় বাসনাচরিতার্থের জন্য যে ভালবাসা, তাহা 'কাম' নামে এবং স্বার্থবিরহিত হইয়া সর্ব্বজীবে ঈশ্বর বা আত্মবুদ্ধিতে যে ভালবাসা, তাহাই প্রকৃত 'প্রেম' নামে অভিহিত। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু আপামরজীবে প্রেম করিতেন অর্থে—সর্ব্ব-জীবের মধ্যে সেই এক—অদ্বিতীয় শ্রীমন্নারায়ণের মূর্ত্তিদর্শন করিয়া 'আপনা হইতে সব অভিন্ন'—এই জ্ঞান করিয়া ভাল বাসিতেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই উচ্চ ভালবাসাকে 'মধুরসের' অন্তর্গত ভক্তির চরম লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় জীব

যাহা দর্শন করেন, তাহাতেই তাঁহার আরাধ্য ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে, যথা—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রেতে হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥"

—মধুররসাশ্রয়ী যে ভক্তি, তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধ-শূন্য! ইহার লক্ষ্য কেবল কৃষ্ণসুখ ও কৃষ্ণপ্রীতি, এবং ইহাই যথার্থ 'প্রেম' নামে অভিহিত।

কিন্তু প্রেম বলিতে সাধারণতঃ বুঝি আমরা—শরীরের সহিত শরীরের অথবা ভোগ্য বস্তুর ভালবাসা ও আসক্তি। বস্তুতঃ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কারণ ঐরূপ ভালবাসার অন্তরে স্বার্থ নিহিত আছে। স্বার্থ থাকিতে পরমার্থের সন্ধান মিলে না, সন্ধান না মিলিলে অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞাত বিষয়ে আসক্তি জন্মে না এবং আসক্তি না জন্মিলে যথার্থ ভালবাসারও উদয় হয় না।

এক্ষণে প্রেমময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক পুণ্য-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি, কি

স্বর্গীয় প্রেমের অনাবিল ধারাই না তাঁহার মধ্যে প্রবাহিত ছিল! 'যত্র জীব তত্র শিব' এই জ্ঞানেই তিনি আচণ্ডালকে আপনার হইতে আপনার করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন জগতের ধর্ম্ম-পঙ্কিলতা দূর করিয়া বিশ্ববাসীকে প্রবুদ্ধ ও শান্তির পথে উন্নীত করিতে! জগতকে এমনই তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন যে, জীবনের চরমোন্নতি নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াও, তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক তিনি মানবের দুঃখ-কষ্ট দূর করিতেই একমাত্র বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার ভালবাসায় বিন্দুমাত্রও স্বার্থ ছিল না; কারণ যখনই আমরা তাঁহার প্রেমপূর্ণ আচরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিব যে—কি স্বার্থের জন্য তিনি ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াও জগতের অনিত্য সুখ-দুঃখে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, কি স্বার্থের জন্য স্বীয় অনন্ত শক্তি-(যাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কালী' বলিতেন) স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে জগৎবিজয়ী করিয়া তুলিয়া ছিলেন, কি স্বার্থের নিমিত্ত ইঁদেরের গৌরী পণ্ডিত ও পণ্ডিত পদ্মলোচনের সিদ্ধাইসমূহ চিরবিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আলোকপন্থায়

অগ্রগামী করিয়াছিলেন এবং কি স্বার্থের জন্য ক শীপুর বাগানে গলরোগের (ক্যান্সার) ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও দয়ায় গলিয়া অগণিত নরনারীকে উপদেশ বিতরণে তিনি কৃতার্থ করিতেন, তখনই বুঝিব যে—স্বার্থকলুষের লেশমাত্র তাঁহার হৃদয়ে ছিল না, ছিল উদার প্রেমের পবিত্র জাহ্নবীধারাই একমাত্র প্রবাহিত! এইজন্যই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, যে প্রেমধারাকে জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন—'বিমলং' অর্থাৎ কামনাদি দোষ বিহীন, 'পবিত্রং'—শুদ্ধিবিধায়ক এবং

(৪) নিঃস্বার্থম্। —অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন বা লাভালাভ-চিন্তাহীন—ইত্যাদি। * * কোন কর্ম্ম ফললাভের আশায় সম্পাদন করিলে তাহাতে স্বার্থ জড়িত থাকে; অর্থাৎ আমি একজনের উপকার সাধন করিতেছি—যেহেতু সে আমাকে তাহার প্রতিদান দিবে, ইহাকে ঠিক উপকার করা বলে না; কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'মা ফলেষু কদাচন'—কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ফলের আশা করিও না; কেন?—'কৃপণা ফলহেতবঃ',—ফলাকাঙ্ক্ষীরাই কৃপণ। অতএব 'ময্যাপিত মনোবুদ্ধি' অথবা 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো'—আমাতে চিন্তাপর হইয়া 'যৎ করোষি যদশ্নাসি

যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'—সকল কর্ম্মই 'শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলিয়া আমাকে অর্পণ করিবে, তাহা হইলে স্বার্থবুদ্ধি আসিবে না। অর্থাৎ গীতায় 'ময্যর্পিত', 'মদর্পনম' ইত্যাদি বাক্য শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্থ বা সমাধিস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এখানে বুঝিতে হইবে যে—আপনাকে বা স্বার্থ বলিদান দিয়া নিজের মধ্যে যে অনন্ত-পুরুষ 'আত্মা' রহিয়াছেন, তিনি এক এবং সমস্ত শরীরেই অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান —ইহা বিদিত হইয়া বা ইহার ধারণা পূর্ব্বক আপনা হইতে অভিন্নজ্ঞানে সকলের উপকার সাধন করা, এবং এরূপ করিলেই অহং ভাবটি আর মনে আসিতে পারে না। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এই ভাবটি জ্বলন্ত আকারে বিদ্যমান ছিল। তিনি বলিতেন— তাঁহার শরীর ধারণ 'লোকশিক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' এবং শ্রীশ্রীভবতারিণীর হাতের যন্ত্রস্বরূপ আসিয়াছেন তিনি বিশ্বজনের সেবা করিয়া কেবল জগৎকে দুই হাতে দান করিবার জন্য, লইতে কিছু আসেন নাই। বাস্তবিক দেখা যায়—দেহকে দেহ জ্ঞান না করিয়া দিবারাত্র কেবল সমাগত ভক্ত ও সন্তানদিগকে তিনি উপদেশ দান করিয়া কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া দিতেন। কাশীপুর

বাগানে রোগ-শয্যায় তিনি শায়িত, চিকিৎসকগণ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি সকল ভুলিয়া—সকল নিষেধ ঠেলিয়া সমাগত ভক্তগণকে অনর্গল উপদেশ দানই করিতেছেন। তখন স্থির থাকিতে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"ওরে! এদের জন্যেই ত আমার আসা; এ হাড়-মাসের দেহটা দিয়ে যদি নারায়ণরূপী এদের (সমাগত ভক্তগণের) একটুও উপকার করতে পারি, তাহলেও শরীর ধারণ করাটা সার্থক হবে।" আহা! স্বার্থলেশ শূন্য আপন ভোলা বিশ্বপাগল শ্রীশ্রীঠাকুর! সত্যই তোমার তুলনা তুমিই জগতে! তোমার নিঃস্বার্থ-পরতা ও অতুলনীয় প্রেমনিদর্শন অতুলনীয়ই বটে!

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর ও প্রিয়-সন্তান আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেইজন্য স্বার্থান্ধ মনুষ্যগণকে আশ্বাস দানে বলিতেছেন, যদি তোমরা সেই নিঃস্বার্থ প্রেম-লাভ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা কর (তদ যদি প্রাপ্তুমিচ্ছসি), তবে—

(৫) আশ্রিতজনান্ প্রণয়ার্দ্রচিত্তান্ কুর্ব্বন্তঃ।

—(যিনি) আশ্রিতজনের শুষ্ক হৃদয়ে স্বার্থহীন প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়া আপ্লুত করিতেন—ইত্যাদি।

বাস্তবিক, কত বিপথগামীকে যে তিনি আশ্রয় দান করিয়া করুণা বিতরণে তাহাদের ঈশ্বরীয়মার্গে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং কত নরনারীই যে তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। একবার শ্রীযুক্ত মথুরামোহন জমিদারী সংক্রান্ত একটি বিবাদ লইয়া তাঁহার বিপক্ষদলের একটি লোকের জীবননাশ করেন। সেই লইয়া বিচারালয়ে মামলা উঠিল এবং প্রতিপদে তাঁহার কারাদণ্ড হইবারই সম্ভবনা উপস্থিত হইল; শ্রীযুক্ত মথুর বিপন্ন ও ভীত হইয়া বিপদের কাণ্ডারী একমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরণাপন্ন হইলেন। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে একটু বিরক্ত ও মথুরকে ভর্ৎসনা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে একান্ত বিপন্ন ও অসহায় দেখিয়া অবশেষে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমায়ের (শ্রীশ্রীভবতারিণী) নিকটে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরের কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাকে ক্ষমা করিতে বালকের ন্যায় আবদার করিলেন এবং শ্রীযুক্ত মথুরও বাস্তবিক আশ্চর্য্যজনকভাবে সেই যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করিলেন। . .

নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের নাম বোধ হয় কাহারও নিকট অবিদিত নাই। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত

অভিনেতা। প্রথম বয়সে তিনি ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, বিলাসিতা ও পান-সম্ভোগই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিরক্ষর বিশ্বপাগল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইল এবং বিলাসিতার একান্তসাধক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র হইলেন তখন সর্ব্বত্যাগী—নির্ম্মল চরিত্র ভগবদ্ পথিক! অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রের সকল দোষ অবগত হইয়াও ক্ষমাগুণে আপনার শ্রীচরণতলে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে, আশ্রিত ভক্তের অক্ষমতা দর্শন করিয়া স্বয়ংই তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং অশেষ করুণাবিগলিত-চিত্তে শ্রীযুক্ত গিরিশকে বলিলেন—'ওরে! কিছু না পারিস্, একটু নিয়ম করে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানের নাম জপ করবি।" কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পক্ষে নিয়ম করিয়া সকাল সন্ধ্যায় নাম জপ করাও যেন অসাধ্যসাধন গুরু কর্ম্ম বলিয়া মনে হইল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন—'বাবা! আমি নিয়ম করিয়া কিছু করিতে পারিব না, এ কর্ম্মও যেন অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হইতেছে।' —'বেশ'! প্রেমার্দ্রহৃদয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বলিলেন—'বেশ, তাও যদি না পারিস, তবে ভক্তিভাবে এখানকার (শ্রীশ্রীঠাকুর বা ঈশ্বরের) কথা স্মরণ করবি, তা হলেই হবে।" কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরিশের পক্ষে উহাও যেন পর্ব্বত প্রমাণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল; বিষম চিন্তায় পতিত হইয়া তিনি বলিলেন —'বাবা! ক্ষমা করুন, এ কার্য্যও আমার দ্বারা হইবে না।'

"আচ্ছা, তা হলে বকলমা দে"

"বকলমা? গিরিশচন্দ্র এইবার একটু আশ্বস্ত হইলেন, ভাবিলেন—মন্দ কি? উনি যদ্যপি কৃপা করিয়া অধমের ভার গ্রহণ করেন, তবে আমি তাহাতে পশ্চাদ্‌পদ হই কেন?" করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন—'দ্যাখ্, আমি তোর সব ভার নিলুম, এবার হ'তে যখন যে কাজ করবি, ভাব্‌বি আমি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) করছি, তুই যন্ত্র মাত্র। তাহাই হইল, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আশ্রিত ভক্তের সকল ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া তাহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। এ'স্থলে কবি রজনীকান্তের এই সঙ্গীতটি মনে পড়ে—

"আহা! তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ তারিতে তাপিত
আতুরে তুলে না লবে গো!

* * * *

তুমি, আপনার হতে হও আপনার,
যার কেহ নাই আছ তুমি তার!"

—ইত্যাদি

বাস্তবিক, অদ্ভুতচরিত্র ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন অলৌকিক পুরুষ—প্রেমের পারাবার ও করুণাসিন্ধু। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বিষয়াসক্ত জড়দৃষ্টিসম্পন্ন আমাদের ভ্রান্ত লালসা [illegible] করিয়া যথার্থ শান্তি প্রদান করিবার জন্য বলিতেছেন,—"স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যদি নিঃস্বার্থ প্রেম লাভ করিতে ইচ্ছা কর; তবে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোর তমসাবৃত গগনে বিকৃত সনাতন-পন্থা ও পাশ্চাত্যপ্রভাবরূপ [illegible]-জাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া যখন নর-নারীর প্রজ্ঞা-চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করিয়া চৈতন্য হইতে জড়ের দিকে তাহাদিগকে প্রবাহিত করিল, তখন মানুষ সদসৎ জ্ঞানহারা হইয়া জড় এবং তৎভোগজাত স্বার্থকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া হইয়া

লইল। 'সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ'— পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ধর্ম্মগ্লানিবিনাশকং' রূপে তখন জগতে অবতীর্ণ হইলেন এবং 'লোকনামেব শিক্ষার্থং' স্বার্থ-পঙ্কিলতা দূর করিবার জন্য নিঃস্বার্থ প্রেমের খেলা খেলিলেন সমগ্র নরনারীর জ্বলন্ত আদর্শ হইয়া! অতএব তাঁহার চিরপবিত্র আদর্শের পূজা করিলে অবশ্যই স্বার্থান্ধকার বিদূরিত হইবে এবং নিঃস্বার্থ প্রেম লাভ করিয়া সকলে জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে!"

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এইবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিঃস্বার্থ প্রেমের কথা পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—মাতা, পিতা ও ভার্য্যা প্রভৃতির ভালবাসা স্বার্থযুক্ত, কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে ছিল স্বার্থশূন্য—নিষ্কলঙ্ক ভালবাসা,—যাহা যথার্থ প্রেমসিন্ধু তুল্য! ইহা তাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহার লীলাসহচরস্বরূপে, এই জন্যই বিমুগ্ধ হইয়া তিনি বলিতেছেন :—

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো,
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতুশূন্যঃ।
যৎ প্রেমহেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং,
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ। ইহ (অস্মিন লোকে) মাতুঃ (জনন্যাঃ) স্নেহঃ (আদরঃ) কারণ সন্নিবদ্ধঃ (হেতুপূর্ব্বকঃ) (ভবতি) হি (নিশ্চয়ে) তথা (তেন প্রকারেণ) ভ্রাতুঃ (সহোদরস্য) পিতুঃ (জনকস্য) চ অয়ং (স্নেহঃ) ন হেতুশূন্যঃ (অহৈতুকো ন, হৈতুক এবেতিভাবঃ)। যং প্রেম (যস্য স্নেহঃ) হেতুরহিতং (অহৈতুকং) (যস্য প্রেম) কেন (কেনচিৎ প্রেম্না) তুল্যং (সদৃশং) ন হি (অবধারণে) প্রেমসিন্ধুসদৃশং (প্রেমসাগরোপমং) তং রামকৃষ্ণং ভজ (একান্ততয়া তদ্‌গুণ-শ্রবণ-বিচারণ-তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহপ্রত্যয়ৈকতানতয়া সমুপাস্স্ব)।

অর্থ। এ জগতে মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা ভার্য্যা —কাহারও প্রেম বা ভালবাসা স্বার্থলেশহীন নহে ; একমাত্র অতুলনীয় প্রেমসিন্ধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই (দেখা গিয়াছে) ভালবাসা যথার্থ স্বার্থহীন ও নির্ম্মল ! অতএব (স্বার্থের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিঃস্বার্থের ঠাকুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর।

দীপিকা। (১) স্নেহো হি মাতুরিহ………ন চ হেতুশূন্যঃ। —সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন একমাত্র (তুরীয়) ব্রহ্ম, যাহা অপেক্ষা আর কোন প্রধান পুরুষ বা বস্তু ছিল না। তিনিই পরে বহু হইতে ইচ্ছা

করিয়া মায়াপাশে ও মায়াপ্রভাবে পূর্ব্ববৎ জগৎ সৃষ্টি করিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দিবারাত্র, জীবজগৎ, বৃক্ষজগৎ প্রভৃতি সৃষ্ট হইল। ব্রহ্ম মায়োপহিত ঈশ্বর বা ভগবান হইয়া জগতের সকলকে এক অনির্ব্বচনীয় ও অনাদি আকর্ষণী শক্তিদ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সেই আকর্ষণশক্তি হইতেছে 'মায়া'—স্নেহ—ভালবাসা বা প্রেম। তিনিই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও ভার্য্যাদি সৃষ্টি করিলেন (অথবা স্বয়ংই হইলেন) এই সকল জগৎ-সংসারকে সজ্জিত করিয়া অভাব হইতে স্বভাবের আলোকে প্রকাশ করিতে! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া তাঁহার এক রহস্যময় খেলা খেলিলেন, তিনি তাঁহার মোহ ও অহংরূপ আবিলতাটিকে সকলের হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষা করিলেন। স্বাভাবিক নিয়মবশে মানুষ

* "ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত॥
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ॥"

—ঋগ্বেদ।

পিতা, পুত্র-কন্যাদি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিলেন, কিন্তু গোপন রাখিলেন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাহাদের সেই ভালবাসার প্রতিদান প্রতিদানকে প্রতীক্ষা করিয়াই তাঁহারা ভালবাসা বা প্রেমের স্বাধীনতাকে পাশবদ্ধ করিলেন স্বার্থপরতারূপ শৃঙ্খল দিয়া, তাই (তাঁহারা) তাহার পূরণে আনন্দিত এবং অভাবে ক্লেশযুক্ত হইয়া আপনাদের তফাৎ করিয়া ফেলিলেন স্বস্বরূপ আত্মা হইতে।

বর্ত্তমানক্ষেত্রে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অভাব দৃষ্টি গোচর হয় না। মাতাপিতা চাহিয়া থাকেন পুত্র-কন্যার মুখ—কবে তাহারা মানুষ হইয়া সাহায্য করিবে তাঁহাদের অর্থ দিয়া এবং পুত্র-কন্যাও তদ্দৃষ্টে শিক্ষা করিয়া থাকে মাতাপিতাকে ভালবাসিতে—নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া। উভয় স্থানেই বাসনা প্রতিহত হইয়া স্নেহ ও ভালবাসা আংশিক অথবা কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। তৎপরে ভার্য্যার ভালবাসা; ইহাতেও বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে—কারণ স্বামীকে জগৎ-স্বামীরূপে দর্শন বা দর্শন করিবার শিক্ষা আমাদের দেশে কয়জন স্ত্রীলোক করেন তাহা জানি না। কিন্তু

ঐভাবের চিন্তাধারা আমাদের দেশেরই (ভারতের) যথার্থ নিজস্ব! তন্ত্র স্ত্রীকে জগন্মাতা—শক্তিমূর্ত্তিতে এবং পুরুষ বা স্বামীকে জগৎপিতা—শিবমূর্ত্তিতে পূজা ও দর্শন করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়—বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা তন্ত্রের সেই ভাবকে যেন অভিভূত করিয়া একমাত্র ভোগ-বিলাসেরই লক্ষ্যেই ভালবাসা ও দর্শনকে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে যতই ভালবাসুন না কেন, সে' ভালবাসার পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে 'স্বার্থ', সুতরাং স্বার্থে যখন তাঁহাদের আঘাত পড়িবে, তখনই তাঁহাদের সেই ভালবাসার শৃঙ্খল ছিন্ন হইবে এবং পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে!

প্রকৃত ভালবাসা হইতেছে আত্মায় আত্মায় —ইহাতে কোন স্বার্থ মিশ্রিত থাকিতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ পতির প্রয়োজনে (স্বার্থসিদ্ধির জন্য) স্ত্রী তাহার পতিকে ভালবাসে না, পরন্তু পতির আত্মার জন্য সে পতিকে

ভালবাসিয়া থাকে। এইরূপ পতি স্ত্রীকে, পিতা পুত্রকে, মানুষ ধন-রত্ন-ভোগসামগ্রীকে আত্মদৃষ্টিতেই ভালবাসিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে—আত্ম-দৃষ্টির উপরেই নিঃস্বার্থ ভালবাসার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত, অন্যথা প্রেমের পরিচ্ছদে কামের বা নিঃস্বার্থতার ছদ্মবেশে স্বার্থের লীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আত্মপরিজন কে কতদূর আপনার জন—তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বেশ একটি গল্প বলিতেন, যথা—জনৈক শিষ্যকে উপদেশ প্রদান-কালে তাহার আচার্য্যদেব বলিলেন—'বৎস! ত্যাগই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা। মাতাপিতা, ভাই-বন্ধু ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভালবাসা স্বার্থ-গরলে দূষিত, অতএব তাহাদের মায়া ত্যাগ করিয়া আমার সহিত চলিয়া আইস।" শিষ্য বলিল—"গুরুদেব! সে কি কথা? মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র আমায় কত ভালবাসেন, তাঁদের কি কখনও নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করিতে পারি?"

—'তা বটে! কিন্তু বৎস! সে ভালবাসার যে কতটুকু মূল্য, তাহা ত তুমি বিদিত নও, সেইজন্য তাদের মায়ায় তুমি মোহিত হইতেছ। আচ্ছা,

আমি তোমায় একপ্রকার ঔষধের বটিকা প্রদান করিতেছি, তাহা সেবন করিলেই তুমি মৃতবৎ হইয়া যাইবে, কিন্তু সংজ্ঞা হারাইবে না। সেই অবস্থায় বুঝিবে, কে তোমার আপনার জন আমি ছদ্মবেশে বৈদ্যরূপে তোমার পার্শ্বে সেই সময় উপস্থিত থাকিব।'—এই বলিয়া আচার্য্যদেব শিষ্যকে একটি বটিকা প্রদান করিলেন, শিষ্যও তাহা গ্রহণ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সকলের অজ্ঞাতে তাহা ভক্ষণ করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, কিন্তু সংজ্ঞা হারাইল না।

এখানে বাটীতে মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গেল। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইল! লোকে লোকারণ্য! এমন সময় গুরুদেব বৈদ্য সাজিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মৃতের উপায় বিধান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—'উপায় আছে, যদ্যপি কেহ মৃতের জন্য জীবন বিনিময় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই পুনরায় জীবন পাইবে, অন্যথা নয়।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল। মাতা

চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন 'না—আমার আরও ত সব ছেলেমেয়ে রহিয়াছে, তাহাদের দেখিবে কে? আর কেহ দিউক।' পিতাও ঠিক ঐ কথা বলিলেন এবং ভ্রাতা, ভগ্নী ও প্রতিবাসিগণ যে যাহার স্থানে সরিয়া পড়িলেন। বৈদ্য তখন মৃতের শোকাকুলা ও রোরুদ্যমানা পত্নীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু পত্নীও তাহার মায়াক্রন্দন থামাইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক বলিল—'আমার ইহারা সব রহিয়াছে, ইহাদের মানুষ করিবে কে? যে যাইবার গিয়াছে, অপরে তাহার জন্য মরে কেন আর?' ইত্যাদি। শিষ্য তখন উঠিয়া পড়িল এবং গুরুদেবকে বলিল 'চলুন গুরুদেব! এইবার আমার সত্যসত্যই জ্ঞান হইয়াছে যে—কেহ কাহার নয়।'

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত অপর একটি গল্পেও আমরা দেখি যে—মৃত স্বামীকে আত্মীয়স্বজনগণ যখন সংকার করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মৃতের হস্তদ্বয় প্রসারিত থাকায় তাহা পারিতেছে না, তখন অশ্রুকুলা পত্নী তাহার প্রতিবাসিগণকে দরজা ভাঙ্গিতে দেখিয়া বলিল—'ওগো! ও কি করছ গো? আমার যে

ছেলেপুলে রয়েছে গো; ঘর জানালা ভাঙ্গলে আমার বাছারা সব কোথা থাক্‌বে গো? তোম্‌রা ওর হাত দু'খানা কেটে ফেলনা, তা হ'লেই ত বেরুবে।' ইত্যাদি।—ইহাই হইল পত্নীর ভালবাসা সংসারে। তৎপরে, পুত্র-কন্যা, স্বজন-বন্ধুবর্গের ত কথাই নাই। স্বার্থ লইয়াই তাঁহারা খেলা করিতেছেন।

সুতরাং সংসারে শান্তিলাভ করিতে হইলে নিঃস্বার্থরূপ খড়্গে স্বার্থকে বলিদান দিতে হইবে। এই বলিদান দেওয়াও কঠিন, কারণ মায়া প্রতি-নিয়তই স্বার্থকে পরমার্থের পদে বসাইয়া নরনারীগণকে মোহিত ও প্রতারিত করিতেছে। এই প্রতারণা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে হইবে এবং 'নেতি নেতি' বিচার দ্বারা সর্ব্ববস্তুতে আপনার সত্তা দর্শন করিয়া আত্মবুদ্ধিতে সকলকে ভালবাসিতে হইবে, তাহা হইলেই নিঃস্বার্থের পবিত্রালোকে বিশ্বপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়া মোক্ষের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে অথবা বিচারে অক্ষম হইলে সৃষ্টি রাজ্যের জীব হিসাবে স্রষ্টা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই মানুষের পক্ষে বিধেয়।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—প্রথমে অদ্বৈত-বুদ্ধির অভাবে না হয় দ্বৈতের শরণ গ্রহণে সৃষ্টি ও স্রষ্টার কল্পনায় ঈশ্বরকে ন্যায়বান, দয়াশীল ও সর্ব্ব-পরিচালক ইত্যাদি জ্ঞান করিলাম, কিন্তু মাত্র কল্পনায় বা শ্রুত বাক্যেই কি সেই বিশ্বাস ও ধারণা স্থিতিশীল হইবে?—না, তা কখনই নয়। অজ্ঞাত বস্তুতে আসক্তিহীন হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম! ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি না, শাস্ত্রে শুনিয়াছি মাত্র, সুতরাং না দেখিয়া ও বিশেষভাবে না জানিয়া কিরূপে তাঁহাতে করুণাময়, ক্ষমাশীল ইত্যাদি বিশেষণ সংজ্ঞা আমরা প্রদান করিতে পারি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—

“যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥”

—অর্থাৎ ঈশ্বরকে (মায়োপহিত ব্রহ্মকে) মন বা বুদ্ধির দ্বারা জানিতে অথবা চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, তিনি ভক্তের জন্য অবতাররূপে দেহ ধারণ করিয়া আসেন। ঈশ্বরের যাবতীয় গুণ বা সিদ্ধিই অবতারে প্রকটিত থাকে। তিনি পরমাত্মা-

স্বরূপ, জ্ঞানসম্পন্ন শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়াও—মায়াকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নশ্বর শরীর ধারণ করেন এবং 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবকে শিখায়'—অর্থাৎ আদর্শস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বিপথগামী ও আত্মবিস্মৃত নরনারীকে মোহরূপ অন্ধকার হইতে হস্তধারণে উত্তোলনপূর্ব্বক মুক্তির পন্থা প্রদর্শন করেন। সৃষ্টপ্রজা—মানুষ তাঁহাকে মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ও আচার্য্য ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া—তাঁহারই আদর্শ প্রবাহে আপনাপন জীবন গঠনপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলে এবং ক্রমোন্নতিদ্বারা আত্মবিকাশসম্পন্ন হইয়া সেই শাশ্বত শান্তিলাভে ধন্য হয়।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব স্বার্থান্ধ মানবগণকে নিঃস্বার্থ-প্রেম লাভ করিবার জন্য আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সেইজন্য বলিয়াছেন—

"যৎ প্রেমহেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং।
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণং॥"

কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই কি কেবল প্রেমের ঠাকুর ছিলেন, আর কেহ কোন যুগে এইরূপ প্রেমাবতার হইয়া আসেন নাই? এখানেও প্রত্যক্ষদর্শী আচার্য্যদেবের

সেই নির্ভীক উত্তর—**"ন হি কেন তুল্যং"**। 'কেন তুল্যং' এ'স্থলে অবতারগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন নাই, পরন্তু মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও কলত্র-পুত্রাদির ভালবাসার সহিত তুলনা করিয়াই বলিয়াছেন। মাতাপিতা—ভার্য্যাদির ভালবাসায় স্বার্থ জড়িত আছে, কিন্তু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভালবাসায় একটুকু স্বার্থ মিশ্রিত ছিল না; তাঁহার পবিত্র-সংস্পর্শে যিনি একবার আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি নির্ম্মল ভালবাসা দিয়া আপনার করিয়া লইতেন; বিন্দুমাত্র আত্মাভিমান না থাকায়, সকলের সহিতই তিনি বালকের মত সমান ভাবে মিশিয়া তাঁহাদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিতেন। আহা! এই নিমিত্তই শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী প্রাণের আবেগে বহুবার বলিতেন—

"তিনি আমাদের ভালবেসে
বশীভূত করেছিলেন।"

স্বামিজী বলিতেন—"মা বাপও সে'রকম ভালবাস্‌তে জানে না। একদিন তাঁর কাছে না গেলে প্রাণ যেন ছট্‌পট্ করে উঠ্‌ত,—এমনই ছিল তাঁর ভালবাসা ও স্নেহের টান।"

শ্লোকে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যৎ প্রেমহেতুরহিতং"—অর্থাৎ যাঁহার প্রেম বা ভালবাসায় কোন হেতু থাকিত না—অহৈতুক! 'হেতু' শব্দের অর্থ হইতেছে লাভাদির আসক্তি বা স্বার্থ; অর্থাৎ একটি কর্ম্ম করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফললাভের বাসনা করিতেছি, নিঃস্বার্থভাবে নহে এবং এই 'হেতু' যাহাতে নাই তাহাই 'অহৈতুক। এই অহৈতুক ভাবের জ্বলন্ত উদাহরণ পাই আমরা পুরাণ ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে এবং প্রত্যক্ষভাবে শ্রীভগবানের রাজা প্রকৃতির খেলায়। ভক্ত ভগবানের অনাবিল প্রেম ও করুণায় আপ্লুত হইয়া যখন গাহিয়া থাকেন—

"নাহি চাও প্রতিদান নাহি রাখ কোন আশা।
নীরবে বাসিছ ভাল ধন্য বটে ভালবাসা॥"

তখন সত্যসত্যই দেখিয়া থাকি যে—তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্যে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্বের দোষ নাই, জগতের ভোগৈশ্বর্য্যে তিনি অবাধ অধিকার সকলকে প্রদান করিয়াছেন। উচ্চ নীচ, স্থাবর জঙ্গম, জাতি অজাতি তাঁহার নিকট সবই সমান, সকলেই তাঁহার সন্তান এবং করুণাপ্রার্থী! অথবা ইহার দৃষ্টান্ত পাই আমরা

সূর্য্যের কিরণ দানে, মেঘের বারি দানে, অগ্নির তাপ দানে এবং বাতাসের সুগন্ধাদি দান প্রভৃতিতে আরও স্পষ্টতররূপে। ইহাদের করুণা অথবা ভালবাসা অহৈতুক রাগেই রঞ্জিত!

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেমও যথার্থ অহৈতুক ছিল; কারণ তিনি ত আর আমাদের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট সাধুজন ছিলেন না. বাহ্যিক আকারটাই যা' ছিল আমাদের মত! তিনি আসিয়াছিলেন জগতের দুঃখে বিগলিত হইয়া, অহং ভাব তাঁহার হৃদয়ে ছিল না; সেই জন্য হৃদয় ছিল তাঁহার বিশ্বজোড়া— প্রেমের জাহ্নবী-ধারাতে পূর্ণ। দ্বৈতভূমিতে যতক্ষণ তিনি থাকিতেন, ততক্ষণ তিনি বলিতেন—'আমি মার হুকুমের চাকর, তিনি যন্ত্রী—আমি যন্ত্র, যেমন চালাচ্ছেন—তেমনি চলছি ইত্যাদি।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

—অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক পুত্তলীকাবৎ সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘূর্ণিত করিতেছেন ইত্যাদি। এই ভাবটি স্পষ্টই

পাই আমরা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্রে। তিনি 'অহং' বা স্বার্থকে চিরদিনের জন্য মাতৃচরণে বলি দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আপনাকে মার হাতের যন্ত্র তুল্য করিয়া অতুলনীয় কর্ম্ম ও ভালবাসা আচণ্ডালকে দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এই অহেতুক প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—'প্রেমসিন্ধুসদৃশং' এবং অনিত্য সাংসারিক মাতা পিতা ও ভার্য্যাদির ভালবাসায় মোহিত ভ্রান্ত মানবগণের ভ্রম দূরীকরণেই বলিয়াছেন—"ন হি কল্প তুল্যং, তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণং।" সেই অহৈতুক প্রেমের সহিত স্বার্থময় মাতাপিতাদির ভালবাসার তুলনাই হইতে পারে না. সেই অতুলনীয় প্রেমদাতা অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরণাপন্ন হইয়া নিঃস্বার্থ প্রেমধারা প্রার্থনা কর, 'লীলাবপুষ হরেরেবং ভক্তার্থং দেহধারিণঃ"—ভক্তের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার ধরায় অবতরণ, তোমার বাসনা পূর্ণ করিয়া তোমাকে অতুলানন্দের অধিকারী করিবেন।

নবম অধ্যায়

এক্ষণে ভক্তগণসমাগমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কিরূপ আনন্দিত এবং তাহাদের বিরহে ব্যথিত হইতেন;—এতদসম্বন্ধেই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিতেছেন, যথা ঃ—

প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না
হ্যন্তর্হিতে ভবতি ভাব বিকারযুক্তা।
আরাদ্ গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভক্তে,
প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ। ইহ (জগতি) ললনা যথা প্রিয়তমে প্রাপ্তে (বল্লভে সমাগতে) প্রসন্না (মুদিতা) ভবতি, অনু (পশ্চাৎ) অন্তর্হিতে (প্রিয়তমে) ভাববিকারযুক্তা (বিরহপীড়িতা) ভবতি, তথা প্রিয়তমে স্বভক্তে আরাদ্ গতে (সমীপং গতে, দূরং গতে) চ

প্রেষ্ঠায়মানং (প্রিয়তমামিবাচরন্তং) তং রামকৃষ্ণং ভজ।

অর্থ। পতিসম্মিলনে ললনা যেরূপ আনন্দিতা এবং তাঁহার বিচ্ছেদে বিরহ নিমিত্ত ক্লান্তা ও অন্যমনা হন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেইরূপ ভক্তসঙ্গে সুখ এবং বিরহে দুঃখ অনুভব করিতেন। অতএব অলৌকিক বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমঘনমূর্ত্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর (প্রেমময়ের পূজায় যথার্থ প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইবে)।

দীপিকা। (১) প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে...... **ভাববিকারযুক্তা।** —অর্থাৎ রমণীগণ প্রিয়তমের সম্মিলনে আনন্দিতা ও বিরহে দুঃখিতা হন, ইহা যে কেবল আধুনিক জগতের ধারা—তাহা নহে, বহুকাল হইতে পতি-পত্নীর এই ভাব বর্তমান রহিয়াছে। পতির জন্য রমণী বহু দুঃখ—অশেষ লাঞ্ছনা ও বিপদাদিকে বরণ করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। পিতৃসত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস গমনের জন্য রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৈরিক পরিধান করিয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সাধ্বী

সীতাদেবীও পরমারাধ্য পতিই তাঁহার গতি—এই সিদ্ধান্ত করিয়া সর্ব্বাভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর অনুগমন করিলেন; তৎপরে ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ মিথ্যা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া যখন ভিখারীবেশে বন-গমনপূর্ব্বক অরণ্যে, নগরের পথে পথে দীনহীনের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া অনশনে, অনিদ্রায় কত বর্ষ অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীও তখন তাঁহাদের সহযাত্রিণী হইয়া সকল অবস্থায় পতিগণের সুখ-দুঃখে আপন ভাগ্য গাঁথিয়া লইয়াছিলেন; সতী সাবিত্রী পতিপ্রেমের উন্মাদনায় স্বীয় জীবনকে বিপন্না করিয়া আকাশপথে মেঘলোকে যমরাজের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন পূর্ব্বক মৃতস্বামীর জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন; সাধ্বী বেহুলা উন্মত্ত স্রোতস্বিনীকে উপেক্ষা করিয়া গলিতকায় স্বামী লক্ষ্মীন্দ্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন—ইত্যাদি কত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাহাদের পশ্চাতে ছিল স্বামী-ভক্তি ও স্বামীর প্রতি অটুট্ ভালবাসার প্রবল উন্মাদনা!

স্বামী—স্ত্রীর যথার্থই ভালবাসার পাত্র, যেহেতু স্বামী তাহার ভার গ্রহণকারী ও সুখ-দুঃখের চিরসহচর।

বিবাহকালে পুরুষ যখন কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার ভাবী পত্নীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। তৎপরে শাস্ত্রে দেখা যায়—পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে গণ্যা, অর্থাৎ পতি যাগ, যজ্ঞ অথবা পুণ্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে পত্নী তাহার অর্দ্ধেক ফলের অধিকারিণী! অতএব এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পতি ও পত্নীর মধ্যে অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ ও ভালবাসা বহুকাল প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্যই উভয় উভয়কে কর্ম্মক্ষেত্ররূপ সংসারে সহায়কস্বরূপে লাভ করিতে সচেষ্ট থাকেন!

কিন্তু "প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না হৃষ্যন্তহিতে ভবতি ভাব বিকারযুক্তা।" অর্থাৎ মিলনে ও বিরহে যে সুখ ও দুঃখ অনুভূত হয়, তাহা যেন শুধু শরীরের বিরহ ও মিলনে পর্য্যবসিত না হয়, কারণ শরীর পাঞ্চভৌতিক জড়, ইহার ধ্বংস আছে—নিত্য নহে; সুতরাং স্বর্গীয় ভালবাসারূপ বস্তুকে অনিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট করিলে, সে ভালবাসার মূল্য থাকে না। জড়ের সহিত জড়ের যে আকর্ষণ, তাহা মোহ মাত্র. মোহকে অতিক্রম করিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টির প্রজাভুক্ত হওয়া; অতএব মোহের মোহিনীজালে না

পতিত হওয়াই বুদ্ধিমতী ললনাগণের কর্ত্তব্য। পতিকে জগৎপতির প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে ভালবাসারূপ অঞ্জলি দিতে পারিলে—সে ভালবাসায় ঈশ্বরের প্রেম অঙ্কুরিত হয় এবং দেবতার অদর্শন ও মিলনের দুঃখ-সুখানুভূতিই যথার্থ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয় ও তাহাতে নারীজীবনের সার্থকতা পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। *

(২) আরাদ্গতে প্রিয়তমে............ভজ রামকৃষ্ণং।—অর্থাৎ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেও শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিতেছেন—ললনাগণ যেরূপ প্রিয়তমের মিলন ও অন্তর্দ্ধানে সুখী ও দুঃখী হন, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেরূপ প্রিয়তম ভক্তগণ-

* পুরুষগণেরও তদ্বিপরীত রমণীমাত্রে মহাশক্তির আরোপদ্বারা পত্নীর প্রতি ভালবাসাকে জগন্মাতার চরণে প্রেমাঞ্জলিস্বরূপে পরিণত করা। * * পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী বলিয়াছেন "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে,—যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই,—সে দেশ, সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পারিবেও না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা।"

মিলনে আনন্দিত ও বিরহে ব্যথিত হইতেন,—এমনই ছিল তাঁহার ভালবাসা! দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে যখন তাঁহার সাধক-জীবন উত্তীর্ণ হইয়াছে ও শ্রীশ্রীজগন্মাতা ভবতারিণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যখন তিনি ধন্য হইয়াছেন, তখন ভাবাবেশে একদিন ভাবি অন্তরঙ্গ সন্তানগণের মূর্ত্তি সমূহ তিনি দেখিতে পাইলেন এবং জগন্মাতাও তাঁহাকেও বলিয়াছিলেন "এর পর তোর ছেলেরা সব একে একে এখানে আসবে।" ছেলেরা ত আসিবে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিন্তু তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা সহ্য হইল না, ভাবাবেশে দৃষ্ট-মূর্ত্তিসকলের প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভাবে আকুল হইয়া উঠিলেন, এবং পঞ্চবটী হইতে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তিনি নহবতের ছাদে উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন —"ওরে! তোরা কে কোথা আছিস্ সব আয় না রে, তোদের জন্য প্রাণ আমার যে অস্থির হয়ে উঠেছে রে।" তাহার কিছুদিন পরে যখন সন্তানগণ (ক) একে

(ক) সন্তানগণ বলিতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর বুঝায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই নিম্নলিখিত একাদশজন সন্তানকে অন্তরঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের স্বহস্তে গৈরিক বসন প্রদান করিয়াছিলেন যথা:—(১) নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ)

একে সব দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিল, তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া তাহাদের আপন সন্তানজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিলেন। * * একদিন নরেন্দ্র আসিয়াছে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর আনন্দ ধরে না, যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন—তাহার নিকটেই নরেন্দ্রের ত্যাগ, তপস্যা, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। আবার নরেন্দ্র হয় ত কোনও কার্য্যে পলক্ষে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর আসিতে পারিল না, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অধীর হইয়া ইহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কিগো! নরেন ত কই আজ এলো না?" আহা! নরেন্দ্রের জন্য

(২) রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) (৩) কালী (স্বামী অভেদানন্দ) (৪) বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) (৫) শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) (৬) তারক (স্বামী শিবানন্দ) (৭) শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) (৮) যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) (৯) লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) (১০) নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) (১১) বুড়োগোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)। ইঁহারা ব্যতীত স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং স্বামী নির্ম্মলানন্দ এই চারিজন ত্যাগী শিষ্যও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘভুক্ত।

লীলাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন কত ব্যাকুলিত, তাই নরেন্দ্র না আসায় তিনি কত দুঃখিত ও ব্যাকুলিত!

কেবল সন্তানগণের জন্য নহে, যে কোন ভক্ত তাঁহার নিকট একদিন উপস্থিত হইতেন, তিনিই তাঁহার অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহলাঞ্ছিত ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া যাইতেন! প্রথম জীবনে অর্থাৎ সাধকাবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকৃতি ছিল অন্য প্রকারের। মানুষের সংস্পর্শ তখন বিষবৎ অসহ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইত! নীরবে—নির্জ্জনে বসিয়া দিবারাত্র গভীর সমাধিতে মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর তখন তাঁহার কাটিয়া যাইত, কিন্তু শেষে তাঁহাকে সেই লোকজন লইয়া পাগল হইতেই শুনা গিয়াছে! গলার অসুখ, কথা কহিতে কষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তগণ আসিয়াছে, তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া অনর্গল ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ডুবিয়া আত্মহারা হইতেছেন! তাঁহার ভালবাসার আকর্ষণই ছিল চুম্বকের মত! ভক্তগণ সেই নিমিত্ত তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং তিনিও সকলের অদর্শনে বালকের মত অধীর হইয়া পড়িতেন। এই অকৃত্রিম—অহৈতুকী ভালবাসার জন্যই বিচার তর্কাদির খেই হারাইয়া পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, গৌরী পণ্ডিত,

ভক্তাগ্রণী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, ভক্ত কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও জগদ্‌বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁহার অপূর্ব্ব আদর্শসম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্লোককর্ত্তা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী এইজন্যই এই অদ্ভুত প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে সকল স্বার্থ ও বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভিক্ষা করিবার জন্য দুঃখক্লেশ জর্জ্জরিত মানবগণকে বলিতেছেন—"ভজ রামকৃষ্ণং"।

আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই জগতে পূজা পাইবার যোগ্য এবং এ'জগতে যিনি যত বেশী ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি তত বেশী জগতের অন্তঃস্থলে আঘাত দিয়া তাহাকে আপনার দিকে টানিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন! বাস্তবিক, উদারচক্ষের সম্মুখে মানুষ সকলেই সমান, ছোট বড় কেহ নাই। তবে ইহা সত্য যে—তাহার মধ্যে পণ্ডিতগণ বিকাশবাদ স্বীকার 'করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—অন্তরের বস্তু একই, কেবল বিকাশকরণের তারতম্যেই এক মানুষ অপরের নিকট ছোট বা বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রও বলেন যে—সেই

মানুষই মানুষ, যিনি আপনার পূর্ণবিকাশ সম্পাদন করিয়া দেবতার আসনে নিজেকে উন্নীত করিয়াছেন, এবং মহাপুরুষ ও অবতার আর কেহ নন, যিনি অন্তর্বাহ্যালোকের একত্ব আবিষ্কার করিয়া আপনি আলোকময় হইতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাপুরুষ বা অবতার (?)

শাস্ত্রে এই মহাপুরুষ ও অবতারগণ সম্বন্ধে দুইটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। যাঁহারা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন—একটি শ্রেণী হইতেছে 'জীবকোটি' ও অপরটি 'ঈশ্বরকোটি'। জীবকোটিরা আপনোদ্যমে সাধন করিয়া মোক্ষের পথ নির্ণয় করেন ও চিরতরে আপন স্বরূপে আনন্দময় হইয়া লীন হইয়া যান (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি), কিন্তু ঈশ্বরকোটিগণ পূর্ণ শান্তি (নির্ব্বিকল্প) ভূমিতে উত্থিত হইয়াও একটু প্রভেদ রাখিয়া দেন—জগতের প্রতি কোন কিছু সদ্বাসনা পোষণ করিয়া এবং এই জন্য তাঁহারা সেই মোক্ষভূমি হইতে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইয়া অবতরণ পূর্ব্বক 'জগদ্ধিতায়' জীবন সমর্পণ করেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জীব ও ঈশ্বর-

কোটিকে স্রোতগামী ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ও বৃহৎ বাহাদুরী কাষ্ঠের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —"ছোট কাঠ কোন রকমে নিজে স্রোত বহে সাগরে গিয়ে পড়ে, সামান্য একটা পাখীর ভারও সহ্য করতে পারে না; কিন্তু বাহাদুরী কাঠ নিজেও যেতে পারে— অপরকেও নিজের পীঠে বহে নিয়ে যেতে পারে।"

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ঈশ্বরকোটি অপেক্ষাও অনেক উচ্চে। তিনি বৃহৎ জাহাজ তুল্য ছিলেন। বাহাদুরী কাষ্ঠ বড় অধিক দুই দশজনকে স্বীয় পৃষ্ঠে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ জাহাজ হাজার হাজার—কোটি কোটি পারের যাত্রীকে লইয়া পরপারে উপস্থিত করিতে পারে। ভগবান শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যুগ-প্রয়োজনে আসিয়া ব্যষ্টির সম্মিলনে সমষ্টি বা 'পরাবতারঃ' হইয়া বিরাটভাবে 'সমন্বয়ের বাণী' প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রচক্ষে সমন্বয়াচার্য্য ধর্ম্মসংস্থাপনকারী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব "যতমত ততপথ!" —এই সমন্বয়-পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদনে সর্ব্বজাতি ও ধর্ম্মের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যিনি অদূর ভবিষ্যতে সকলকে একতাসূত্রে ও প্রেমের বন্ধনে

বন্ধন করিবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন এই ধরণীতলে, তাঁহাকে বরণ করিয়া ও তাঁহার উদারমার্গে বিচরণ করিয়া ধন্য হইবার জন্য শ্রীমৎ আচার্য্যদেব আমাদের—সকল অবিশ্বাসের দ্বারে আঘাত প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছেন—'তং ভজ রামকৃষ্ণং' —'তং' অর্থাৎ সেই অলৌকিক প্রেমঘনমূর্ত্তি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রাদর্শ 'ভজ' অর্থাৎ বন্দনা কর এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত আদর্শবানকে প্রাণের অর্ঘ্য দান করিয়া পূজা কর,—শান্তি পাইবে!

দশম অধ্যায়

মাত্র প্রেমাবতার বলিলেই যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার অথবা জগদ্‌গুরুরূপে পূজ্য হইবেন, তাহা হইতে পারে না। এ'জগতে যিনি ভবরোগবৈদ্যস্বরূপে মায়া-রোগাক্রান্ত নরনারীকে উদ্ধার করিয়া মোক্ষ ও শান্তির আলোক প্রদান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ জগতের ঠাকুর বলিয়া পূজা পাইবার যোগ্য। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব শিষ্যের সংশয় দূর করিবার জন্য নিম্নোক্ত শ্লোকের অবতারণায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসীম ক্ষমতা অথবা করুণার কথা প্রকাশপূর্ব্বক—তাঁহাকে বন্দনার যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, যথা—

সংসার-দুঃখ-বিকৃতো ভজনানুরাগঃ,
শুদ্ধীকৃতঃ প্রিয়কথা-করুণাকটাক্ষৈঃ।
আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা,
স্তং ধর্ম্মমোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণং ॥১০॥

অন্বয়ঃ। অহো (বিস্ময়ে) (যেন) সংসার-দুঃখ বিকৃতঃ (ইষ্টবিনাশাদিদুঃখেন বিকৃতিং গতঃ) ভজনানু-রাগঃ (পরমেশসেবনোৎসাহঃ) প্রিয়কথা-করুণা কটাক্ষৈঃ (চিত্ততোষিণ্যা কথয়া প্রসন্নেন চেক্ষণেন) শুদ্ধীকৃতঃ (স্বভাবমানীতঃ) (অভূৎ, যেন) পুরুষার্থকামাঃ (ধর্ম্মাদিচতুষ্টয়প্রেপ্সবঃ) (চ) প্রতিদিনম্ (অহরহঃ) আশ্বাসিতাঃ (অলং চিত্তবৈকল্যেন মনোরথাস্তে সিদ্ধিং গমিষ্যন্তীত্যাপায়িতাঃ) (অভূবন্) ধর্ম্মমোক্ষদং (বেদ-বোধিত কর্ত্তব্যতাকেহনুরাগজননদ্বারা ধর্ম্মদং ধর্ম্মদ্বারা চ মোক্ষদম্) তং (প্রসিদ্ধং) রামকৃষ্ণং ভজ (একাগ্রতয়া তদ্গুণশ্রবণ বিচারণ তদমলসত্ত্বময়বিগ্রহ প্রতীকধ্যানতয়া সমুপাস্স্ব) ॥

অর্থ। সাংসারিক শোক-তাপাদি দুঃখে চিত্তের মলিনতাবশতঃ যাহাদের ঈশ্বরে ভক্তি—বিশ্বাস ও অনুরাগ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও প্রাণতোষিণী সুমধুর উপদেশ বাণী দ্বারা যিনি তাহাদের চিত্তমালিন্য সংশোধন করিয়া প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ আনাইয়া দিতেন এবং যিনি চতুর্বর্গ পুরুষার্থ ফলাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রতিদিন আশ্বাস-বাণী দ্বারা উৎসাহিত করিতেন,

সেই ধর্ম্ম ও মোক্ষদাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা কর।

দীপিকা। (১) সংসার দুঃখ.........করুণা-কটাক্ষৈঃ।—অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখ-তাপে বিকৃতচিত্ত-নরনারীগণ যাঁহার ঈশ্বরভজনানুরাগদায়ী চিত্তপ্রসাদকর-বাণী ও করুণাকটাক্ষে শুদ্ধ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন —ইত্যাদি। * * পূর্ব্বে সংসার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। তবে অতি সংক্ষেপে এখানে ইহার পরিচয় দিতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে—সং + সার,—অর্থাৎ 'সং' বা ভবরূপ রঙ্গমঞ্চে নটনটীরূপে আগমন করা যথার্থ 'সার' বা সার্থক হয়—যদ্যপি আমাদের জ্ঞান থাকে যে ভোগভূমি এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ইহার প্রজার হৃদয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেওয়া, এবং এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যিনি নির্লিপ্তাবস্থায় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধক, জগতে মায়াবরণ তাঁহাকেই যথার্থ সার্থকতা প্রদান করে, অন্যথা 'সং' দেওয়াই হয় সার না হইয়া অসার, অর্থাৎ আসা-যাওয়াই কেবল বৃথা হয়।

এক্ষণে কথা আসিতেছে—"ভজনানুরাগঃ"—ভজন (ভগবদ্‌নাম বা তদ্‌গুণকীর্ত্তনে) অনুরাগঃ

(আসক্তি) বাক্যটি প্রয়োগ করিবার এখানে সার্থকতা কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—'সংসার-দুঃখবিকৃতঃ'—অর্থাৎ ইষ্ট বা পরমার্থ বিস্মৃত, অনিত্য বিষয়ে রত ও সাংসারিক শোক-তাপাদি দুঃখে বিকৃতচিত্ত-নরনারীগণ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন করিতেন শান্তি লাভ করিবার জন্য ;—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে 'ভজনানুরাগঃ।'

ভজনের প্রকৃতার্থ হইতেছে সাধন,—যে সাধনে অনর্থ সংসার-গমনাগমন নিরাকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সাধনে মনুষ্যের কখন প্রবৃত্তি জাগরিত হয়? না—যখন তাহার এই সকল ভোগ্যবস্তুতে অনিত্যজ্ঞান সমুদিত হইয়া তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়—তখন, তখনই সে নিত্যানিত্য-বিবেকদ্বারা বিচারের তীক্ষ্ণধার কৃপাণে মিথ্যাজাত বস্তুসকলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, এবং এই যে অগ্রসরাদির প্রচেষ্টা ও প্রণালী, ইহাই 'সাধন' নামে অভিহিত। সাধনাবস্থায় অদ্বৈতভূমি লক্ষিত থাকে এবং দ্বৈতভূমির ধারা ব্যক্তাবস্থায় তখন সাধককে লইয়া সাধ্য, সাধক ও সাধন—এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়।

বাস্তবিক, সাধনক্ষেত্রে সাধ্য না থাকিলে সাধনার প্রবৃত্তি জাগে না এবং সাধনাশ্রয়ী না হইলে যথার্থ সাধকও হওয়া যায় না। যিনি আপনাকে দ্বৈত ভাবিয়া অদ্বৈতের প্রতি ছুটিয়া চলেন সেই সাধ্য ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া, তিনিই হন 'সাধক'। ব্রহ্মই হইলেন সকলের স্বরূপ, তাঁহাতে মিশ্রণ বা তদাকার-কারিত হওয়াই মানবজীবনের চরমোন্নতি!

কিন্তু কথা হইতেছে—ব্রহ্মই যদ্যপি সকলের চরম লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হন, তবে প্রতি নরনারীতে সেই মিশ্রণ বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত না হইবারই বা তাহা হইলে কারণ কি? শাস্ত্র বলিবেন—সৃষ্টির সদ্ভাব রক্ষা করিবার জন্য! একই কালে প্রতি নরনারীতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদ্যপি জাগিয়া উঠিত, তবে একই কালে প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া সকলে শ্রেয়োমার্গে 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' লাভ করিবার জন্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের দিকে ছুটিয়া বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু স্রষ্টার তাহা অভিপ্রেত নহে, সৃষ্টিধ্বংসে মুক্তির পথ রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রকৃতির নাই। এ'জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —'মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।'—অর্থাৎ সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে হয়ত একজনের মুক্তির

ইচ্ছা জাগরিত হয় এবং পুনঃ সহস্র সহস্র পিপাসুর মধ্যে হয়ত একজন সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াতীত হইয়া যান্। অতএব দেখা যাইতেছে যে—মায়াই এখানে (সংসারে) প্রবল !

কিন্তু শাস্ত্র পুনরায় বলিয়াছেন'—

"ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

অথবা বলিয়াছেন—'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈ-কেনামৃতত্ত্বমানশুঃ।' সুতরাং ইহাও সত্য যে—সংসার বা প্রেয়ের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেয়ের পথেই আমাদিগকে ধাবিত হইতে হইবে, কারণ 'শ্রেয়ঃ'ই যথার্থ শান্তিপ্রদ ও আমাদের কাম্য !

কঠোপনিষদে দেখা যায় শ্রদ্ধাবান নচিকেতাকে পরীক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানবান যমরাজ যখন বলিলেন—

"শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥"

—অর্থাৎ হে নচিকেত! তুমি শত বর্ষায়ু পুত্র-পৌত্র প্রার্থনা কর; বহু পশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব ও পৃথিবীর রাজ্যসকল প্রার্থনা কর এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ করিবার বর প্রার্থনা কর, সুখ পাইবে। তখন বিবেকবান্ নচিকেতা 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো' ইত্যাদি বলিয়া একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিতে চাহিলেন। ধর্ম্মরাজ যম তখন সন্তুষ্ট হইয়া সংসার বা প্রেয়ের অসারতা বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ—"

—শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ সুখকর ভোগ্য বস্তু পরস্পর বিভিন্ন ;—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"

—অর্থাৎ ইহারা (শ্রেয় ও প্রেয়) মনুষ্যকে আশ্রয় করে; জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। তিনি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগ-ক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

প্রেয়কে ত্যাগ করিলেই মোক্ষ করতলগত হয় এবং যথার্থ ত্যাগ বাহ্যিক চিহ্নাদি ধারণে হয় না, হয় একমাত্র অন্তর্দ্দেশ পরিষ্করণের দ্বারা! মনের ময়লা (বৃত্তি) দূর করিয়া অন্তর নির্ম্মল করিতে হইবে এবং তবেই সেই সংস্কৃত মন তখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সন্ধান দানে বিচারমার্গে উন্নীত করিয়া আত্মস্বরূপে মনকে স্থাপনদ্বারা একীবৃত্তি করাইবে ; কারণ "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ"—অর্থাৎ মনকে আত্মা বা স্বরূপে স্থির করিলেই বৃত্তি নিরোধ ঘটে এবং তখনই 'তদা দ্রষ্টু স্বরূপেঽবস্থানম্' অবস্থা আসে। অতএব ভজন বা সাধনে অনুরাগ প্রয়োজন—সেই সাধ্য বা মুক্তিকে লাভ করিয়া সাংসারিক যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য!

তবে মানুষ শক্তিমান হইলেও যতক্ষণ সে মায়ার সীমামধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে আপনাকে দুর্ব্বলই ভাবিয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত সে তত্ত্বজ্ঞ ও জগদ্রহস্যের বিশ্লেষণে আলোক-পন্থা

প্রদর্শনকারী একজন সহায়কের মুখাপেক্ষী হয়—তাহাকে মোক্ষমার্গে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য! এই শুদ্ধ-মুক্তস্বভাববান সহায়কই হইতেছেন সংসারে গুরু, আচার্য্য ও অবতার প্রভৃতি নামে অভিহিত।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন যেন আলোকস্তম্ভ স্বরূপ! এই সংসাররূপ তমসাবৃত সাগরবক্ষে অসংখ্য জীবরূপী তরণি দুঃখ-তাপাদি তরঙ্গবিক্ষোভিত হইয়া, পরিশ্রান্ত ও ভ্রান্তপ্রায় পথের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব করুণায় অবতীর্ণ হইয়া দেখাইলেন তাহাদের সত্যমার্গ এবং তাহারাই হইল "শুদ্ধীকৃতঃ প্রিয়কথাকরুণাকটাক্ষৈঃ।" সংসারের দুর্ব্বিসহ দুঃখভারাক্রান্ত কত নরনারী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রাণের বেদনা জানাইত, করুণাবতার—তিনিও তাহাদের সকল কথা শ্রবণ করিয়া সকলকে শান্তি প্রদান করিতেন। কত নাস্তিক, কত বিপথগামী তাঁহার নিকটে আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গসুখলাভে তাহারা ধন্য হইয়া গিয়াছে! যাহার যেরূপ ভাব, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই সাধনের পথ দেখাইয়া দিয়া উচ্চানুভূতির দিকে তুলিয়া লইতেন। রুক্ষভাব তাঁহার বীণাবিনিন্দিত

বাক্যে কখনও প্রকাশ পাইত না; এত স্নেহে—এত আবেগভরে ভক্তগণকে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন যে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়া আঘাত করিত। ছোট-বড় জ্ঞান তাঁহার অন্তর হইতে এককালে বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল, এজন্য সকলের প্রতি সমভাবেই করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তিনি সমর্থ হইতেন!

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন যেন শান্তি-নিকেতন! অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চিন্তাভারাক্রান্ত নরনারীগণ যখন তাঁহার নিকট একটু শান্তিলাভ করিবার জন্য উপস্থিত হইত, তখন তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন এবং বলিতেন —"ওগো! টাকা, কড়ি, মান, যশে কিছু নাই, ও সব অশান্তিরই বোঝা কেবল; তোমরা তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাক, প্রাণে শান্তি পাবে। আর কেন? অনেক ত কিছু ভোগ করলে, এবার ষোল আনা মনটা তাঁর পাদপদ্মে দাও"—ইত্যাদি। * * এঁড়িয়াদহের কৃষ্ণকিশোর আসিয়াছেন, বড় সাধের উপযুক্ত পুত্রটি তাঁহার অকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে, করুণাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ

কৃষ্ণকিশোরের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সকল আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়া কত সহানুভূতি ও সমবেদনার স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"তা ভেবে আর কি কর্‌বে বল? আহা! অক্ষয় (১) যখন আমার মারা গেল, তখন প্রাণটা যেন ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, অক্ষয়ের শোকে বালকের মত কেঁদে ফেল্লুম। * * তা' এ সব মায়া বই ত নয়? কেউ কার' নয় গো—কেউ কার' নয়, একমাত্র ঈশ্বরই আপনার।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকজর্জ্জরিত কৃষ্ণকিশোর সকল দুঃখ শোক ভুলিয়া গেলেন এবং মন তখন তাঁহার এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া আনন্দময় রাজ্যে বিরাজ করিতে লাগিল! আহা! এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অপার করুণা ও ভালবাসার কখনও ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না! কারণ একমাত্র তাঁহার করুণায়ই—

---

(১) ৺অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

(২) আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামাঃ।
—পুরুষার্থকামী অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থাদি চতুর্ব্বর্গকাঙ্ক্ষিগণ প্রতিনিয়ত তাঁহার দ্বারা আশ্বস্ত হইতেন। যে কেহ তাঁহার নিকটে ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছে, তাহাকেই তিনি "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া কোলে টানিয়া শুনাইয়াছেন—

"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
*   *   *
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥"

—হে শিষ্য! ব্যাকুলিত হইও না, ভবসাগর পারের পন্থা আমি তোমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি।

—এই যে ভক্তের সকল অন্ধকার অপসৃত করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলার দায়িত্ব, ইহা কে গ্রহণ করিতে পারে? একমাত্র শুদ্ধ-বুদ্ধাত্মা ঈশ্বরাবতারের পক্ষেই ইহা সম্ভব! বদ্ধের ক্ষমতা এইরূপ হইতে পারে না, 'অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ' তুল্য বদ্ধ-নিয়ন্তৃত পথিক মোহ-গর্ত্তেই পতিত হয়।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রিয় সন্তানদের বলিতেন—লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার জন্ম।

বাস্তবিক, সাধকজীবন যখন তাঁহার সমাপ্ত হইল, শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বলিলেন—'তুই ভাব মুখে থাক্, ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্যই তোর জন্ম।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সে'জন্য সিদ্ধ হইয়াও বালকভাবে যন্ত্রতুল্য রহিলেন জগতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত। প্রথমে অনেকে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে যখন তাঁহার অপূর্ব্ব গাঁথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন দলে দলে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল! যে' পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকগণ ধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিত, জগৎটা সব Natureএর (প্রকৃতির) খেয়াল বলিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণার পরিসমাপ্তি সাধন করিত, সেই নব্যশিক্ষিতগণই দলে দলে আসিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে মস্তক বিক্রয় করিতে লাগিল। জানিনা—নিরক্ষর উন্মত্ত বিশ্বপূজারীর মধ্যে তাহারা কি অমূল্য রত্নের সন্ধান লাভ করিয়াছিল!

এক্ষণে 'পুরুষার্থকামাঃ' কথাটি মাত্র 'মোক্ষকামী' অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। অর্থাৎ মোক্ষকামী যাঁহারা, তাঁহাদেরই তিনি যথার্থ অধিকারী বলিয়া কৃপা করিতেন। কিন্তু ইহাতে ত তাঁহার প্রতি

পক্ষপাতিত্ব দোষের আরোপ করা যাইতে পারে? শাস্ত্রকার বলিবেন—না, অধিকারীই যথার্থ সর্ব্ববিষয়ে প্রবেশলাভ করিবার যোগ্য! শিশুর নিকটে যদ্যপি জটিল গ্রহতত্ত্ব-রহস্যের বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সে কি তাহা বোধায়ত্ত করিতে পারে? প্রকৃত ক্ষেত্র চাই; উষরভূমিতে যেরূপ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, অনধিকারীর হৃদয়েও সেইরূপ আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব বিকাশলাভ করিতে পারে না; এই নিমিত্ত শ্রুতিসমূহে দৃষ্ট হয়—শিষ্যগণ সমিৎপাণি ও জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া আচার্য্যসমীপে গমন করিত এবং যথার্থ অধিকারী হইলে তবে আচার্য্যদেব প্রসন্ন মনে তাহাদের উপদেশ করিতেন। যথা—বিধি নিবদ্ধ আছে যে—

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমন্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদসত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"

—মণ্ডুক। ২২। ১৩

—অর্থাৎ অভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেব সমীপাগত—সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্ত (অর্থাৎ যাহার চিত্ত হইতে দম্ভ-দ্বেষাদি

দোষ বিদূরিত হইয়াছে) ও শমগুণান্বিত সেই শিষ্যের উদ্দেশ্যে—যাহাদ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বিবৃত করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে—আচার্য্য বা অভিজ্ঞ সহায়ক ব্যতীত আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে উন্নতি করা অসম্ভব। মণ্ডুক ভাষ্যে (২১।১২) শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন—'শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ—পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি—পিপাসিত যে, তাহাকে জল দিলেই যে'রূপ দানের সার্থকতা রক্ষিত হয়, সে'রূপ অধিকারী যে—তাহাকে মোক্ষোপদেশ করিলেই তাহা যথার্থ সফল হইয়া থাকে। অধিকারী নির্ণয়ে 'বেদান্তসার' প্রণেতা সদানন্দ বলিয়াছেন—"অয়মধিকারী জননমরণাদি-সংসারানলসন্তপ্তঃ প্রদীপ্তশিরাজলরাশিমিবোপহার-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্যতমনুসরতি।" —অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে প্রখর সূর্য্যকরে তাপিতশিরা হইলে তাপশান্তির জন্য টাকরোগী ব্যক্তি যে'রূপ গভীর জলাশয়ে অবতরণ করে, সেইরূপ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য ত্রিবিধ-দুঃখ, জন্ম, জরা ও

ব্যাধিতে দহ্যমান হইয়া তৎশান্তিরজন্য বেদ-বেদাঙ্গজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর নিকট গমন করিবে ও কায়মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করিবে ইত্যাদি।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও দিব্যচক্ষে যাহাদের যথার্থ জিজ্ঞাসু ও মুক্তিকামী বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহাদের নিকটই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কহিয়া তাহাদের প্রবুদ্ধ করিতেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপার কথা আর কত বলিব? একদিন কাশীপুর বাগানে ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন, সন্তানগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত, এমন সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে দ্বিতল হইতে নীচে বাগানের বৃক্ষতলে কল্পতরুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তগণের মধ্যে যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে তিনি 'তাহাই হইবে' বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ অর্থ কামনা করিয়াছিল (যেমন বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), কেহ পুত্র কামনা করিয়াছিল (যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ), কেহ বা জ্ঞান-সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল (যেমন ভাই ভূপতি) ইত্যাদি; আবার কাহাকেও বা তিনি স্পর্শ করিয়া সমাধিমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, সে'জন্য ভক্তগণ অদ্যাপি সেই স্মারক দিনকে পবিত্রজ্ঞানে

'কল্পতরুদিবস' উৎসব করিয়া থাকেন। ইহা সত্য যে, এ'রূপ শক্তি সাক্ষাৎ ভগবান ব্যতীত অপর কাহারও হইতে পারে না। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব এই নিমিত্তই 'আশ্বাসিতাঃ পুরুষার্থকামাঃ' বাক্যের উল্লেখ করিয়া সেই ভবরোগবৈদ্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে নিঃশ্রেয়স যে ধর্ম্ম ও মোক্ষ, তাহা অনায়াসে অধিগত হইয়া মনুষ্যজীবন জয়মণ্ডিত হইবে, কারণ তিনিই যথার্থ—

(৩) **ধর্ম্মমোক্ষদম্।** —ধর্ম্ম ও মোক্ষদাতা; অতএব তাঁহাকেই ভজনা কর।

এক্ষণে 'ধর্ম্ম' বলিতে আমরা বুঝি কি? শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যের মুখবন্ধে ইহার লক্ষণসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতু র্যঃ স ধর্ম্মো।"—অর্থাৎ জগতের স্থিতিকারণ, প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (মঙ্গলদায়ক) যাহা, তাহাই 'ধর্ম্ম'। অথবা 'বেদবোধিত কর্ত্তব্যই' ধর্ম্ম নামে অভিহিত। আচার্য্যদেব পুনরায় বলিয়াছেন—"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ" ইত্যাদি,—অর্থাৎ সেই ভগবান এই জগত সৃষ্টিপূর্ব্বক

ইহার স্থিতিকরণে অভিলাষী হইয়া প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্ম পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। তাহার পর বলিয়াছেন—"দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্ম যথা—জৈমিনীপ্রবর্ত্তিত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সম্পদ ও স্বর্গসুখলাভার্থ যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা, এবং ইহাতে বীতরাগ হইয়া শম, দম ও তিতিক্ষাদি সাধনদ্বারা জন্ম-মৃত্যু-জরা প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ লাভার্থে জ্ঞানমার্গে বিচরণের নাম—'নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্ম'। তবে "অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ",—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। আচার্য্যদেব উক্ত প্রবৃত্তিমার্গ—ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক ও সূর্য্যলোকাদি দিব্যমার্গ দিয়াই ক্রমে "ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ।"—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ও ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হইবে ও জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা প্রদান করিবে ইত্যাদি বলিয়াছেন। তবে অপরাপর আচার্য্যগণ যেরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে কর্ম্মপর, অর্থাৎ

একেবারে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না—কর্ম্মই প্রথমে অনুষ্ঠেয়, তৎপরে জ্ঞানভূমির অধিকার লাভ করা যায় বলিয়াছেন, শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু তাহা মানেন না; তাঁহার মতে—জ্ঞান কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না, তবে কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির একটি উপায় মাত্র বটে। তিনি বলিয়াছেন—কর্ম্ম না করিয়াও শম, দমাদি ষট্‌সম্পত্তি-সহায়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও 'নেতি নেতি' বিচারাদিদ্বারা সেই নিত্যবস্তুকে মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে। যাহা হউক ধর্ম্ম যে বেদবোধিত জ্ঞানলাভের মার্গ-স্বরূপ, ইহা কোনমতে অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

শঙ্করাচার্য্যদেব পুনঃ বলিয়াছেন—"অধর্ম্মেণাভি-ভূয়মানে ধর্ম্মে———তদধীনত্বাদ্‌বর্ণাশ্রমভেদানাম্‌।" —অর্থাৎ বিবেক-বিজ্ঞানের হানিকারক অধর্ম্মের (বেদবিরোধী কর্ম্মাদির) দ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হইলে, জগতের স্থিতি-পরিপালনেচ্ছু আদিকর্ত্তা নারায়ণরূপী বিষ্ণু—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বের রক্ষাবিধানে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েন। যেহেতু ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইলে বৈদিক ধর্ম্মকে রক্ষা করা হয়, কারণ বর্ণাশ্রমভেদ তাহারই অধীন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদিকধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই

ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা, জ্ঞানী, ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টৃগণই বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষাকারী এবং বর্ণাশ্রমাদির আদর্শস্বরূপ। আনন্দগিরি তৎকৃত টীকায় বলিয়াছেন— "ব্রাহ্মণং হি পুরোধায় ক্ষত্রাদি প্রতিষ্ঠাং প্রতিপদ্যতে যাজনাধ্যাপনয়োস্তদ্ধর্ম্মত্বা তদ্দ্বারা চ বর্ণাশ্রমভেদ-ব্যবস্থাপনাদ্ অতো ব্রাহ্মণ্যে রক্ষিতে সর্ব্বমপি সুরক্ষিতং ভবতীত্যর্থঃ।" যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম যদ্যপি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, তবে তাহার রহস্যজ্ঞাতা অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ও অন্যের কর্ম্মসকল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনশীল নিয়মাধীনে তৎসমূহও ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিকৃত হয়, চৈতন্যোপাসনাভ্রষ্ট জড়গামী নরনারী বৈদিক ধর্ম্মকে কুসংস্কার জ্ঞান করিয়া সুবিধাবাদী ও যথেচ্ছাচারী হয়। তাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালিত হয় না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মের নামে বেদবোধিত বিধি-নিষেধবর্জ্জিত অধর্ম্ম আচরণ করিতে থাকে। এই ধারাই চলিয়া আসিতেছে অনন্তকাল হইতে এবং ইহার সংস্কারার্থে যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে শ্রীভগবান ধরায় অবতরণ করিয়া ধর্ম্ম পরিপালন করিয়া থাকেন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখি, তিনিও আসিয়াছিলেন বৈদিকমার্গ সংরক্ষণকল্পে। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশে (ভারতে) যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। একদিকে যে'রূপ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গ বিকৃত হইয়া নেড়া নেড়ি সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল, অপরদিকে সে'রূপ তন্ত্রাচারীর অজুহাতে ভ্রষ্টাচারসম্পন্ন শক্তি-সাধকগণের দৌর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অত্যাচারে বঙ্গদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর', 'জীবে দয়া, নামে রুচি'—এই অহিংসার পবিত্রালোকে প্রেমের বন্যা ছড়ানই ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উদ্দেশ্য ছিল এবং স্ত্রীমাত্রে মাতৃজ্ঞান ও পুরুষমাত্রে শিবজ্ঞান সংক্রমিত করিবার জন্যই ত তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু কালের আবর্ত্তগতিতে ও প্রকৃতির নিয়মে তাহা পরিণত হইয়াছিল বিকৃত মূর্ত্তিতে। সুতরাং, ধর্ম্ম বলিতে লোকে তখন শিহরিয়া উঠিত এইজন্য; ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি ও ব্যভিচারের ভয়ে ঘৃণার দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিত সকলে!

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম তখন যেন একটা অনাচারের প্রবাহে পরিণত হইয়াছিল, তাই নরনারীগণ দলে দলে পাশ্চাত্যের খৃষ্টধর্ম্ম-পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, বেদ—বেদান্ত ও পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্র অনাবশ্যক গাঁজাখোরের প্রলাপবাক্যস্তূপ বলিয়া তাহারা মনে করিল। পাশ্চাত্যজাতিও সুদূর সাগরপার হইতে আসিয়া—সেই ধারণানলে অবিশ্বাসের ইন্ধন জোগাইয়া বলিল—'তোমরা ঈশাকে ভজনা কর, বাইবেলই এ' যুগের একমাত্র পবিত্র গ্রন্থ এবং তোমাদের শাস্ত্র সব কুসংস্কারের বোঝা! ফেলিয়া দাও তাহা গঙ্গার জলে এবং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কর, নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিবে'—ইত্যাদি। বিবেক-বিচারহীন আমরাও চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম—একদিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনাচার ও অপরদিকে তন্ত্রের বীভৎস বামাচার, সন্দেহ ও ঘৃণার অন্ধকারে বৈদিক সনাতন-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া—গা ভাসাইয়া দিলাম পাশ্চাত্যধর্ম্মের জড়তা ও নাস্তিকতার প্রবাহে, খৃষ্টান মিশনারীরাও আমাদের সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন তাঁহাদের ধর্ম্মে স্থান দিয়া।

তখনই হইল ধর্ম্মের সংস্কার প্রয়োজন! মহাত্মা রামমোহন রায় সে'জন্য আবির্ভূত হইয়া খৃষ্টানধর্ম্মে আস্থাবান নরনারীকে ফিরাইবার জন্য প্রচার করিলেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম"—যাহা অর্দ্ধহিন্দু ও অর্দ্ধখৃষ্টান ধারার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি অনেকটা আস্থা ফিরিয়া আসিল এবং অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্মের মোহ কাটাইয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবার কোন আশাই লক্ষিত হইল না; সেই নিমিত্ত অবিশ্বাসী ও বিপথগামী মনুষ্যগণকে সনাতন প্রবাহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বৈদিক-মার্গসংরক্ষণকারী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের খোলে (শরীরে) অবতীর্ণ হইলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,—তাহাও সুদূর পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র কুটিরে! নিরক্ষর থাকিয়া মাত্র সাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়া তিনি বুঝাইলেন যে—ঋষিগণের বাক্য মিথ্যা নহে, শাস্ত্র অনুভূতির ভাণ্ডার এবং সাধনা-পথে অগ্রসর হইয়া প্রাচীন ঋষিরা সত্য সত্যই সেই নিত্যবস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া দ্রষ্টা-স্বরূপে জগদ্ধিতায় তাহা শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পাঠশালায় গিয়া যোগের পর আর বিয়োগ শিখিতে পারিলেন না ; কারণ তখনই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে—জীব ও ব্রহ্মের সংযোগ সাধনেই মুক্তি অধিগত হয়, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, সেই অদ্বিতীয় হইতে কোন বস্তুর বিয়োগ হইতে পারে না ; কারণ বিয়োগ করিলে তাহা দ্বৈত মূর্ত্তিতে প্রতিভাসিত হয়। সুতরাং যোগেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইল। তিনি বলিতেন—চালকলা বাঁধা বিদ্যায় তাঁহার বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, এইজন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত তিনি কলিকাতার সন্নিকটস্থ ঝামাপুকুরে আগমন করিলেন ও তৎপরে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পাগল পূজারীরূপে বৃত হইলেন। তথায় বিদুষী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, একে একে চৌষট্টি খানি তন্ত্র সাধনদ্বারা মৃণ্ময়ী মাকে চিণ্ময়ী করিয়া জগন্মাতার পুত্ররূপে কত আবদার—কত প্রেমলীলা সম্পন্ন করিলেন ! তৎপরে বৈদান্তিক তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণে দ্বৈত ছাড়িয়া অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক ভুবনমোহিনী মায়ের করুণাময়ী মূর্ত্তিকে শতছিন্ন করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মসমুদ্রের অগাধ

নীরে লীনপ্রায় হইলেন,—কিন্তু আবার প্রভেদ রাখিলেন একটু সত্তা—এই অনাচারপ্লাবিত উন্মার্গগামী জগতের প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া !

তাহারপর গোবিন্দ ফকিরের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে, খৃষ্টসাধকের নিকট খৃষ্টধর্ম্মে, জনৈক বৈষ্ণবাচার্য্য সমীপে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন তাহাদের উপাস্য দেবতা মহম্মদ, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং 'সকল ধর্ম্মই এক লক্ষ্যে উপস্থিত করে, সকলই সত্য' ইহা অনুভব করিয়া জগতকে সেই অভিনব-বাণী শুনাইলেন "যত মত তত পথ", অর্থাৎ—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং ।
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

—অর্থাৎ নদিসকল ঋজু ও বক্র পথ দিয়া অগ্রসর হইলেও যে'রূপ পরিশেষে অনন্ত সাগরেই মিশ্রিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমার্গগামী নরনারীও সে'রূপ শেষে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসমুদ্রেই মিশ্রিত হইবেন। তিনি তন্ত্র, পুরাণ—বেদান্তাদি স্বয়ং মানিয়া এবং সাধন করিয়া অনুভূতিদ্বারা বুঝাইয়াছিলেন—'হে নরনারি !

তোমাদের বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা বা প্রলাপ বাক্যস্তূপ নহে, এবং সনাতনধর্ম্ম তোমাদের সনাতনই আছে, মাত্র প্রদর্শক ও অনুভূতির অভাবে ইহার সত্যরাশিকে তোমরা ধরিতে পার না ; অতএব—;

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥"

—গীতা ।১৮ শঃ ৪৭

—তোমরা যে যাহার ধর্ম্মে থাকিয়া সত্যের অন্বেষণ কর, বুঝিবে—সকল সত্য !

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন জগতে কোন ধর্ম্মমতকে ধ্বংস করিতে নয়, পরন্তু চিরপ্রবহমান করিতেই ! নিজের নূতন ধর্ম্ম বলিতে তিনি কোন কিছুই প্রচার করিয়া যান্ নাই, পরন্তু সকলকেই তিনি সমভাবে সম্মান প্রদান করিতেন। সনাতন প্রবাহে মানুষ পুনরায় গা ভাসাইয়া দিয়া সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রে উপস্থিত হয়—ইহাই ছিল তাঁহার বাসনা এবং এই জন্যই সমন্বয়াচার্য্যরূপে তিনি মানবকে শাস্ত্র-সম্মত ও আধ্যাত্মিক মার্গে সুশৃঙ্খলায় চলিতে উপদেশ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন উদারভাবে। রুদ্ধপ্রবাহ

ধর্ম্মকে পুনঃপ্রবাহিত করিয়া আলোকপন্থা নিদর্শনের জন্যই শ্রীমৎ আচার্য্যদেব তাঁহাকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) বলিয়াছেন—"ধর্ম্মদ"।

তৎপরে পুনরায় এই 'ধর্ম্ম' শব্দের ধাতুগত অর্থের অনুধাবন করিলে আমরা দেখি—(১) ধৃ+ম্যন্—ধর্ম্ম। 'ধৃ' ধাতু অর্থে ধারণ করা অর্থাৎ যাহা সর্ব্ববস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন অথবা যাঁহাতে চতুর্দ্দশভুবন—স্থাবর জঙ্গমাদি পর্য্যবসিত, তাহাই ধর্ম্ম বা 'ব্রহ্ম'। শ্রুতি ইহারই লক্ষণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" [তৈত্তিরীয় ৩।১।১] (২) দ্বিতীয়ার্থ হইতেছে—'ধৃ' অর্থাৎ যাহা ধারণ করিয়া আছে জীব ও ব্রহ্মকে, আত্মা ও পরমাত্মাকে—কার্য্য (সৃষ্টি) এবং কারণকে (cause and effect); অর্থাৎ যে মার্গ অবলম্বন করিয়া জীব তাহার স্বস্বরূপ ব্রহ্মে উপনীত হয়, সেই সংযুক্ত মার্গই 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত। (৩) তৃতীয়ার্থ হইতেছে—ব্যবহারিক অভিধানে; যৃথা ধর্ম্মার্থে—স্বভাব বা গুণ। অগ্নির ধর্ম্ম দহন করা, জলের ধর্ম্ম সিক্ত করা, মানুষের ধর্ম্ম বিচারসম্পন্ন হইয়া দেশ, দশ ও স্বীয় কল্যানার্থে

সংসার-ধর্ম্ম অথবা স্ব স্ব আশ্রমের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা ইত্যাদি।

পুনঃ প্রজাপতি মনু ধর্ম্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

—মনু ৬।৯২

—অর্থাৎ ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার না করা) দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার) অস্তেয় (অন্যায় ভাবে পরধন হরণ না করা) শৌচ (মৃদ্বারিদ্বারা শাস্ত্রসম্মত দেহ শোধন) ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী (শাস্ত্রতত্ত্ব-জ্ঞান) বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) সত্য (যথার্থ-কথন) ও অক্রোধ (ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা)—এই দশবিধই ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা হউক, ধর্ম্ম শব্দের বহু প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কেহ বলিতেছেন সৎসঙ্গ, কেহ বলিতেছেন—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণ, কাহারও মতে—যদ্দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, অথবা অহিংসা বা মানুষের কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম। কাহারও মতে আবার দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের পাপ-

পুণ্যাদিবিষয়ক বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণ-লাভাদি উদ্দেশ্যে—অনুসৃত উপাসনাপদ্ধতিই ধর্ম্ম; কিন্তু জ্ঞানবাদী বলেন, মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহাই ধর্ম্ম; অথবা আরও পরিষ্কাররূপে বলা যায় যে, ধর্ম্মের প্রকৃতার্থ হইতেছে ব্রহ্ম হইতে জীবসংযুক্ত মার্গ, যে মার্গের অবলম্বনে সাংসারিক আধি-ব্যাধি—দুঃখ-শোকের হস্ত হইতে মানুষ চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে।

অতঃপর আসিতেছে—"মোক্ষদম্—অর্থাৎ মুক্তি। মুক্তি চতুর্ব্বর্গ ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও চতুর্থ অনাময়-পদ। ধর্ম্মার্থ-কামে মানুষ যখন তৃপ্তকাম হইয়া তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হয়, তখনই সে প্রবৃত্তিপথ বিসর্জ্জন দিয়া নিবৃত্তিমার্গ—সেই মোক্ষকে লাভ করিতে উন্মুখ হয়, এবং যখনই সে সচেষ্ট হয়, তখনই তাহার জীবনে 'ধর্ম্ম' আরম্ভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষের বাসনা জাগরিত হইলে অথবা আত্মসত্তা বিদিত হইবার উপরই 'ধর্ম্ম' অভিধানটির সার্থকতা বিদ্যমান।

কিন্তু এই ইচ্ছা কি আপনি আসে—না কোন কিছুর সহায়তার অপেক্ষা করে? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইহা স্বাভাবিক বটে—আবার আপেক্ষিকও বটে। স্বাভাবিক এই হিসাবে যে, আত্মা চিরদিনই নির্ম্মল—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, মায়া-মরীচিকায় ক্ষণিক বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু 'নেতি নেতি' বিচার করিলে মানুষ স্বয়ংই আপনার মোক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হয়, এবং আপেক্ষিক এই হিসাবে—যথা, বীজের মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষের যাবতীয় উপাদান ও পূর্ণাবয়ব সুপ্তাবস্থায় (কারণাকারে) নিহিত থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য যেরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও সূর্য্যকিরণের সহায়তা অতীব প্রয়োজন, সেরূপ আমাদের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা সুপ্তাবস্থায় থাকিলেও, তাহার পূর্ণাভিব্যক্তির নিমিত্ত বাহিরের সাহায্য যথা—সৎসঙ্গ, আচার্য্য ও শাস্ত্রোপদেশ প্রভৃতির সহায়তা একান্ত আবশ্যক; অন্যথা ভোগের মোহে সে ইচ্ছা জাগ্রতা হয় না। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন সেইজন্য উদার যুগসংস্কাররূপে ভ্রান্ত পথিককে ধর্ম্ম ও মোক্ষের পথ দেখাইয়া আত্মবিকাশের সিংহাসনে উন্নীত করিতে। তিনি বলিতেন—"এখানে যে আস্‌বে, তার শেষ জন্ম। * * এখানের কথা মনে করলেই সেই

ভগবানের কথা মনে পড়বে। ** ঐ মন্দিরের মধ্যে যে মা বিরাজ করছেন, তিনিই এই শরীরটার মধ্যে রয়েছেন ইত্যাদি।” এই সকল কথার দ্বারা আত্মাভিমানত্যাগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই কি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কে জানে ?

যাহা হউক, এই অত্যদ্ভুত বিশ্বপ্রেমিক শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনী আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া যাইব! বাল্যকালে সেই হরিৎ মাঠের মাঝে যখন তিনি নীলাকাশে শ্বেতবর্ণ সারসদলকে অবলোকন করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল বনমালাশোভিত বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ভুবনমোহন রূপ! সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নিষ্কম্প প্রদীপ তুল্য তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন!

আবার দেশে লাহাবাবুদের বাটীতে যাত্রার দল আসিয়াছে, শিবরাত্রিতে শিবলীলা অভিনয় হইবে, কিন্তু শিব যিনি সাজিবেন তিনি অনুপস্থিত, কাজেই বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। দলের

অধিকারী মহাশয়ের পূর্ব্ব হইতেই গদাধরের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিষয় জানা ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ গদাধরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকেই শিবের ভূমিকায় অভিনয় করিতে অনুরোধ করিলেন। সদানন্দ বালক গদাধর স্বীকৃত হইল, তাহার অঙ্গে বিভূতি, কর্ণে ধুস্তুরা, গলে রুদ্রমালা, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে ত্রিশূল ও ডমরু দিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব বেশে সাজান হইল, ভাবে ঢল ঢল— প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জ্যোতির্ম্ময় বালক গদাধর সাক্ষাৎ শূলপাণিতুল্য বিরাজ করিতে লাগিল। ক্রমে অভিনয় আরম্ভ হইল। হরপার্ব্বতী-সংবাদে কৈলাস-পতির আবির্ভাবকাল সমুপস্থিত হইল, কিন্তু অভিনেতা গদাধরের পক্ষে অভিনয়মঞ্চে অবতরণ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। বালক যথার্থ শিবের অনুপ্রেরণায় একেবারে গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া প্রদীপ্ত লালট—প্রশান্ত বদন ও অর্দ্ধনিবদ্ধ-স্তিমিত নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল।

আবার মনে পড়ে তাঁহার সেই আম্রকাননে, গোচারণে বৃন্দাবনের রাখাল বালকগণের ক্রীড়া,— মনে পড়ে অপূর্ব্ব বালক গদাধরকে গোপালরূপে

পল্লীনারীগণের সেই অপার্থিব ভালবাসা। মনে পড়ে—শূদ্রা হইলেও ধনী কামরাণীর ভিক্ষাগ্রহণে তাঁহার অপূর্ব্ব করুণার কথা! আহা, কত কথাই না মনে পড়ে তাঁহার স্বর্ণস্মৃতির পবিত্রালোচনায়। তিনি পাঠ ত্যাগ করিয়া অহরহঃ বুঁধুই মোড়লের ও ভূতির খালের শ্মশানে গভীর নিশায় ধ্যান করিতেন—আর ভাবিতেন, তাঁহার উপর জগতের এক প্রধান সমস্যার সমাধানকরণ অপেক্ষা করিতেছে, তিনি এ'রাজ্যের মানুষ নহেন, অমৃতময় দেশের নায়ক আসিয়াছেন—অভয় শঙ্খ শ্রবণ করাইয়া মৃত্যুপথযাত্রি বিপন্ন নরনারীকে আলোকরাজ্যে পন্থা প্রদর্শন করিতে। তাহারপর কত ঝড় বহিয়া গেল,—সাধ্য, সাধক ও সাধনার ভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি জগতের দুঃখে আত্মভোলা হইয়া তদ্দূরীকরণে মাতিয়া গেলেন, সন্তানরা মাতিল, দেশ-বিদেশও মাতিতে চলিল,—জগতে এক অপূর্ব্ব ভাবের বন্যা ছুটিতে লাগিল!

ইহাই হইল আধ্যাত্মিক ও অমীমাংসিত রহস্যের খেলা! সনাতন ধর্ম্মের প্রবাহ রুদ্ধ হইলেই একটি বিশেষ শক্তি আসেন—বিশ্বের করুণাসমষ্টির প্রতীক্ হইয়া, পন্থা প্রদর্শন করিয়া আবার মিশিয়া যান এই

বিরাট বিশ্বের অন্তঃস্থলে এবং জগতে তখন আলোকের বন্যা ছুটিয়া চলে, আবার আঁধার হয়, আবার অভয় শঙ্খ বাজাইয়া আলোকদাতা অবতীর্ণ হন সেই আঁধার দূর করিতে,—যুগ যুগ ধরিয়া এই ধারা কেবল চলিতেই থাকে; এইজন্য শাস্ত্রকার ইহাকে সৃষ্টি বা মায়া আখ্যা প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—ইহা অনাদি, অনন্ত, সদসৎ উভয়ের অতীত ও অনির্ব্বচণীয়;—অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি কতদিনে তাহা নির্ণয় করিতে না পারায় ইহাকে 'অনাদি' এবং অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহাকারে বিদ্যমান বলিয়া 'অনন্ত' বলা হয়। তবে শাস্ত্রকার বলেন—মায়ার ঐ অনন্তত্বের অন্ত হইতে পারে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে, অন্যথা—"অজ্ঞানন্তু—সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং, জ্ঞান-বিরোধি, ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদন্তি",—অর্থাৎ মায়ার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মায়া দুরত্যয়া হইলেও 'আমার' যে শরণগ্রহণ করে, সে তাঁহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।" অতএব, বাগানে প্রবেশ করিয়া পাতা গুনিয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের আবশ্যকতা নাই, মালিক বা মায়াধীশ যিনি, তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই যথেষ্ট

হইবে; অথবা যুগে যুগে যিনি জীব-কল্যাণ সাধনে নিরাকার হইয়াও সাকাররূপে ধরায় অবতরণপূর্ব্বক করুণ-করে আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করেন, সেই ভবকর্ণধার যুগ-আদর্শের শরণ গ্রহণ করিলে আমাদের মায়ান্ধকার বিদূরিত হইবে। শ্লোককর্ত্তা শ্রীমৎ আচার্য্য অভেদানন্দজী এই জন্যই বলিয়াছেন—

"কৃশাণুবৎ তাপবিদগ্ধচিত্তাঃ,
সংসারিণঃ শান্তিনিকেতনং ত্বাং।
সংপ্রাপ্য শান্তা হি ভবন্তি তেষাং,
ত্বং শান্তিদাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥"

—অর্থাৎ হে কামকাঞ্চনত্যাগি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য উদার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব! তুমি অগ্নিসদৃশ শোক-তাপ বিদগ্ধ নরনারীগণের শান্তি নিকেতন স্বরূপ। তোমার অপূর্ব্ব করুণাবলে তাহারা সংসার-পাশ মুক্ত হইয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করিবে, কারণ—তুমি আসিয়াছ যুগকল্যাণে—অশান্তিতে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার জন্য—ইত্যাদি। তৎপরে পাছে কেহ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে সঙ্কীর্ণতা চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার

অভয় সঙ্কেতের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎসন্দেহ দূরীকরণে বলিয়াছেন—

"পূজিতা যেন বৈ শশ্বৎ সর্ব্বেঽপি সাম্প্রদায়িকাঃ।
সম্প্রদায়বিহীনো যঃ সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি॥"

—অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়কে নিন্দাও যিনি করিলেন না এবং কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে যিনি আপনাকে আবদ্ধও করিলেন না, পরন্তু উদারমতাবলম্বী হইয়া—

"সত্যবোধতয়া সাঙ্গান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ সমাচরন্।
ধর্ম্মমাত্রন্তু সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতং॥"

—সকল ধর্ম্মকেই সত্যজ্ঞান করিয়া প্রত্যেকের অঙ্গসহ বিচার ও সাধন করিয়া যিনি জানিলেন যে—পন্থা মাত্র বিভিন্ন, কিন্তু সত্য এক, সকল ধর্ম্ম সেই এক শান্তি-সমুদ্রেই উপস্থিত করে,—সেই উদার বিশ্বপ্রেমিক ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র উপদেশ-গাঁথা অনুসরণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তোমাদের দুঃখে বিগলিত হইয়াই তিনি মানব-শরীর পরিগ্রহ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—শান্তি পাইবে,

তোমাদের সকল সঙ্কীর্ণতা—সকল বিবাদের চির অবসান হইয়া হৃদয় বিশ্বপ্রেমের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং জীবন সমস্যার সমাধান করিয়া যথার্থ আনন্দ বা মুক্তিলাভে তোমরা ধন্য হইয়া যাইবে !

ওঁ শান্তিঃ

পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

সাধারণভাবে যে বর্ণাশুদ্ধি ও পতনগুলি চক্ষে পতিত হইয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণের সুবিধার জন্য তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া প্রদত্ত হইল এবং অন্যান্য ত্রুটী ও ভুল পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
সত্ত্বেও	৫	১৯	সত্ত্বেও
তদনুগামী	৭	৭	তদনুগামিনী
বিবেকচড়ামনি	৭	১৭	বিবেকচূড়ামণি
গুরোহিতং	৮	১৯	গুরোহিতং
ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে	১২	১৯	ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ে
করিতেছে ?	১৩	২	করিতেছ ?
মায়া	১৫	১৯	মায়য়া
সদেব সৌমেদ	১৭	২	সদেব সৌম্যেদ
থাকে	১৮	৫	থাকে না,
সিদ্ধিনাং	২৮	২০	সিদ্ধানাং
বলা হইয়াছে	২৯	১০	শ্লোকে বলা হইয়া

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
মিমাংসা	৪৫	৩	মীমাংসা
সমষ্ঠিবিগ্রহ্		১১	সমষ্টিবিগ্রহ
পয়সার্নবইব	৫৩	১৮	পয়সামর্ণব ইব
দেহেন্দ্রিয়াস্য	৬০	৩	দেহেন্দ্রিয়াদ্য
মামেবৈষ্যযি	৮৩	১৯	মামেবৈষ্যসি
াবভ্রমহরং	৮৫	৬	বিভ্রমহরং
রজস্তমঃ সংক্রতমতে	৮৬	২	রজস্তমঃসংক্রতমতে
লইয়াছি	৮৭	১	লইয়াছি বলিয়া
আত্মতত্ত্বোপদেশহীন	৮৮	১	আত্মতত্ত্বোপদেশহীন শাস্ত্রে
কাণাদের	৯৭	৩	কণাদের
ইহারা কেবল শাস্ত্র জড় লইয়াই ব্যস্ত	১০৩	২	ইহারা কেবল জড় লইয়াই ব্যস্ত
সমষ্ঠিই	১০৭	১৭	সমষ্টিই
স্বপক্ষস্থাপনহীন	১১১	১৯	স্বপক্ষস্থাপনহীন।
শুষ্কবিচার	১১৫	১৪	শুষ্কবিচার।
স্ত্র-পুরুস	১২৭	৩	স্ত্রী-পুরুষ
জগতের খেলা	১২৭	৭	জগতের খেলা!
নারিগণের	১২৯	১৭	নারীগণের
ভার্য্যামেশষ···	১৩৮	৪	ভার্য্যামশেষ···

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
প্রকর্ষখ্যাপনামুকুল	১৩৮	১৩	প্রকর্ষখ্যাপনানুকূল
প্রত্যয়ৈকতয়া	১৬৭	১৯	প্রত্যয়ৈকতানতয়া
ষায়	১৮৫	৯	যায়
মর্ষ্যাপিত	১৯৭	১৯	মর্য্যার্পিত
ব্যষ্টির সম্মিলনে সমষ্ঠি	২৩০	১৩	ব্যষ্টির সম্মিলনে সমষ্টি